সাম্যবাদ

করোনা মহামারীতে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের কঙ্কালসার চেহারাটাই বেরিয়ে পড়ল	৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপমহাদেশে সেক্যুলার মানবতাবাদের পথিকৃৎ	৪
কৃষক ফ্রন্টের পরিবর্তিত নাম 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন'	৫
ভারত-চীনের দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব প্রসঙ্গে	৮

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০, মূল্য ৫ টাকা

ধর্ষক ও পৃষ্ঠপোষকদের রুখে দাঁড়ান নারীর মর্যাদা ও সমঅধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসুন

–কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সারাদেশের শোষিত-নির্যাতিত মানুষ এবং মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাথে আমরা উদ্বিগ্নতার সাথে লক্ষ করছি যে, আমাদের দেশের বুকে কী ভয়াবহ নারীনির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে। আপনারা জানেন – সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলি লক্ষ করলেই দেখতে পারবেন – ঘটনার পর ঘটনা ঘটছে। আমি কিন্তু সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি না। কারণ, অনেক ঘটনা আপনারা নিজেরা জানেন। আমি দুই-তিনটি মর্মান্তিক ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। কুষ্টিয়ায় একটা ঘটনা ঘটেছে, যেখানে স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করছিল। এমন সময় স্ত্রীর বোন তাকে রক্ষা করতে যায়। তখন তাকে তার স্বামী রেপ করে। তারপরে তার স্বামীর ভাইয়েরা মেয়েটিকে রেপ করে। এ কী ভয়ংকর দৃশ্য! এসব কান্ড বাংলাদেশে ঘটে চলেছে। তারপরে মাদ্রাসার এক ছাত্রী, তাকে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ধর্ষণ করে পালিয়ে গেছে। মাদ্রাসাগুলি হয়ে গেছে শিশু নির্যাতনের বড় কেন্দ্র। আপনারা জানেন যে, সিলেটে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন কীভাবে একজন গৃহবধূকে নির্যাতন করল। তার স্বামীকে বেঁধে রেখে এ কী ভয়ংকর অত্যাচার। নোয়াখালীতে এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করা হলো। কারা এগুলো ঘটনা ঘটাচ্ছে তা আপনারা জানেন। আমি কয়েকটি ঘটনার কথা বললাম। কী অবস্থা দেখুন – মানুষের নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ কোথায় নেমে গেছে! বাবা হয়ে সন্তানকেও অত্যাচার করেছে – এমন ঘটনাও আছে। এগুলো বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। মেয়েরা কিছু কিছু প্রতিবাদ করছে, কিন্তু যে প্রতিবাদ সারাদেশে হওয়া দরকার, তা হচ্ছে না। এটাতো শুধু মেয়েদের বিষয় না, এটা সমস্ত মানব সমাজের ব্যাপার, সমস্ত সভ্য শিক্ষিত মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর ব্যাপার। নারীনির্যাতন শুরু হয়েছে সেই নারী যখন পুরুষের অধীনস্থ হলো, তখন থেকে।

● ২ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ : কেন বাড়ছে? প্রতিকারের পথ কী?

শাহবাগে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের অবস্থান কর্মসূচি

কয়েকদিনের ব্যবধানে পরপর কয়েকটি নারীনির্যাতনের ঘটনায় কেঁপে উঠেছে গোটা দেশ। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সাভারে স্কুলছাত্রীকে খোলা রাস্তায় ছুরি মেরে খুন, খাগড়াছড়িতে সেটেলার বাঙ্গালী যুবকদের আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ ও সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সংঘবদ্ধ ধর্ষণ। এরপরই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ঘরে ঢুকে বিবাহিতা মহিলাকে বিবস্ত্র করে বর্বরোচিত যৌন নির্যাতন করেছে যুবলীগের সাথে যুক্ত কিছু বখাটে যুবক। সেই কুৎসিত ঘটনার ভিডিও ধারণ করে নিজেদের 'কৃতিত্ব' প্রচারের জন্য তা ছড়িয়ে দিয়েছে অভিযুক্তরা। এর মাঝে কেটে গেছে ৩২ দিন। আক্রমণকারীরা সরকারী দলের আশ্রয়ে থাকায় আক্রান্ত মহিলা বিচার চাইতে সাহস করেননি, এলাকাছাড়া হয়েছেন। প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা ভয়ে মুখ খোলেনি, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে নির্যাতনকারীরা। নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার হবার পরে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পুলিশ ও প্রশাসনের টনক নড়েছে। বিশেষ করে এই ঘটনার পর মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সারাদেশে নারীরা ও ছাত্র-যুবকরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নেমে এসেছেন রাজপথে। ধর্ষক ও তাদের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে, নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদার দাবিতে, সর্বোপরি আওয়ামী লীগ সরকার-প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রশ্রয়দানের বিরুদ্ধে সূচিত হয়েছে অভূতপূর্ব এক আন্দোলন।

বিচারের দাবি উঠেছে বারবার। এসকল ঘটনায় সাধারণ চিত্র হলো–ঘটনা যারা ঘটায়, তারা সরকারি দল ও তাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত কিংবা প্রভাবশালী। আর যারা ঘটনার শিকার হন, তারা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মানুষ। এদেশে প্রভাবশালীদের বিচার হয় না, সাধারণ মানুষ বিচার পায় না। বিচারহীনতার এক দীর্ঘ সংস্কৃতির কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে।

এটা ঠিক যে বিচার হওয়া দরকার। সেজন্য কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন দরকার। কিন্তু এও সত্য যে–শুধু আইন প্রয়োগেই এই ঘটনাগুলো ঘটা বন্ধ করতে পারবে না। দিনের পর দিন এই ঘটনাগুলো নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার দিক থেকে আগের ঘটনাগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে আশংকা হয়–এটা আরও ব্যাপ্তি নিয়ে ছড়াবে, আরও নির্মম ও তীব্র হবে। মেয়েরা ধর্ষিত-লাঞ্ছিত হতে থাকবে, ঘরে ঘরে নিপীড়ন বাড়বে। ধর্ষণ রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই পরিণতি ঠেকানো যাবে না।

স্থায়ী সমাধানের পথ কী? এই প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে আছে আরও অনেকগুলো প্রশ্ন। কেন এমন ঘটনা ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? কারা এদেরকে সহযোগিতা করছে? এদের শক্তি কোথায়? এরা কি জন্ম থেকেই এমন বিকৃত মানসিকতা

● ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ : কার লাভ, কার ক্ষতি

৫ অক্টোবর বাম জোটের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ঘেরাও

আওয়ামী লীগ সরকার কোনো নোটিশ ছাড়াই রাষ্ট্রায়ত্ত ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দিল। এর ফলে বেকারে পরিণত হলো স্থায়ী, বদলি ও দৈনিকভিত্তিক প্রায় ৫৭ হাজার শ্রমিক। মিলগুলোকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করা লাখ লাখ দোকানদার, হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশার মানুষ উচ্ছেদ হবে ও জীবিকা হারাবে। শুধু শ্রমিক ও এলাকাবাসী নয়, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৪০ লাখ পাটচাষি। সবমিলিয়ে পাটশিল্প ও পাটচাষের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত সর্বমোট ৪ কোটি মানুষ। করোনা মহামারিতে পুরো দুনিয়ায় যখন মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন, বিভিন্ন দেশের সরকার নানা প্রণোদনা দিয়ে জনগণকে রক্ষার চেষ্টা করছে, ঠিক সেসময় বাংলাদেশ সরকার কারখানা বন্ধ করে হাজার হাজার শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে অমানবিকতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

ছাঁটাই হওয়া স্থায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগের চাকরি স্থায়ী হয়েছে ৮/১০বছর। এ মধ্য বয়সে তাদের অন্য কোনো কাজ করা কঠিন। সম্পূর্ণ অস্থায়ী শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন চালানো ৫টি মিলের শ্রমিক এবং অন্যান্য মিলের বদলি-দৈনিকভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা সরকার দেয়নি। সরকারি পাটকল একটা নির্দিষ্ট দামে চাষিদের কাছ থেকে পাট কিনতো। সরকার আর পাট না কেনায়, বেসরকারি পাটকলগুলো সিন্ডিকেট করে ইচ্ছেমতো পাটের দাম নিয়ন্ত্রণ করবে। পাটচাষিরা বঞ্চিত হবে পাটের ন্যায্য দাম থেকে। ভারতে কাঁচা পাট চোরাচালান বাড়বে। সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি।

প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি

সারা বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে, পাটের বিরাট সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, সেসময় কেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকল বন্ধ করা হলো? প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক। প্রবল সমালোচনার মুখে তাই সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গত ২ জুলাই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিল–"আধুনিকায়ন ও রিমডেলিংয়ের জন্য উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে পিপিপি(পাবলিক প্রাইভেট

● ২ এর পাতায় দেখুন

করোনায় বিপর্যস্ত জনগণের জীবন-জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় চাই আন্দোলন

দেশে করোনাভাইরাসে শনাক্তের সংখ্যা ৪ লাখের কাছাকাছি। কোভিড আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষ(৮ অক্টোবর পর্যন্ত)। বেসরকারি একটি সংস্থা কেবলমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর সংগ্রহ করে জানিয়েছে–দেশে এপর্যন্ত করোনা উপসর্গে (পরীক্ষা করা হয়নি) মারা গেছেন আরও অন্তত ৩ হাজার মানুষ। বর্তমানে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা গড়ে ২০-৩০ জন। বিশেষম করে বয়স্করা ও বিভিন্ন রোগে এক্রান্তরা বেশি বিপদগ্রস্ত। অনেক দেশের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে আক্রান্তের হার বেশি বাংলাদেশে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো-জনবল-জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার-প্রণোদনার অভাব ও অনেকের আতঙ্কের কারণে রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে না। আত্মকেন্দ্রিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আক্রান্তরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের পাশে পাচ্ছেন না। চীন ২ মাস এবং ইউরোপের অনেক দেশ ৩-৪ মাসের মধ্যে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশে ৭ মাস পরও সংক্রমণ চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিচারে – পরীক্ষার তুলনায় শনাক্ত ৫% এর কম হলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলা যায়। তার লক্ষণ দেশে দেখা যাচ্ছে না, এখানে শনাক্তের হার এখনো ১২%-এর ওপরে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ একটি দীর্ঘমেয়াদী বৃহত্তর সংক্রমণের দিকে যাচ্ছে। আরও কত মানুষের মৃত্যু ঘটবে আমরা জানি না। অথচ, সরকারের মন্ত্রীরা কোভিড নিয়ন্ত্রণে সফলতার দাবি করছেন।

মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ আওয়ামী লীগ সরকার

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে চীনে প্রথম করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, আর গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। প্রস্তুতির জন্য ৩ মাস সময় পেলেও সরকার দেশে ভাইরাসের প্রবেশ ঠেকানো ও সংক্রমণ সীমিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার সেইসময় ব্যস্ত ছিল শতকোটি টাকা ব্যয়ে মুজিববর্ষ উদ্বোধনের আয়োজনে। সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী টেস্ট, আইসোলেশন, ট্রেসিং, কোয়ারেন্টিন, লকডাউন–কোনোটাই এদেশে ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত করা হয়নি। শুরু থেকেই পরীক্ষার সংখ্যা সীমিত রাখার নীতি অনুসরণ করে আসছিল সরকার। ঢিলেঢালা লকডাউন তুলে দেওয়ার পর জুন মাসে আক্রান্ত ও মৃত্যু যখন দ্রুত বাড়ছিল, তখন করোনা পরীক্ষায় ফি আরোপ করা হয়। ফলে পরীক্ষার সংখ্যা আরও কমে যায়। সীমিত করোনা পরীক্ষা, ফি আরোপ, সময়মতো রিপোর্ট না মেলা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কার কারণে পরীক্ষা করাতে

● ৭ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ : কার লাভ, কার ক্ষতি

পার্টনারশীপ)-এর আওতায় আধুনিকায়ন করে এসব পাটকলগুলো উৎপাদনমুখী করা হবে। পরে এ কারখানাগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান শ্রমিকদের প্রাধান্য দেয়া হবে।” পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী তখন বলেছিলেন–সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করা হবে। যে কেউ বুঝতে পারবেন, বাস্তবে শ্রমিকদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই এসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল! এখন পাটমন্ত্রী বলছেন–পিপিপি করতে ৩-৪ বছর সময় লাগবে, ব্যবসায়ীরা ৯৯ বছরের লিজ চান। তাই এসব পাটকল লিজ ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে।

সেপ্টেম্বর শেষ হলো, করিম জুট মিল ছাড়া আর কোনো মিলের শ্রমিকরা বকেয়া পাওনা পাননি। বকেয়া ও পাওনা শেষ পর্যন্ত পাবেন কিনা, তা নিয়ে স্থায়ী শ্রমিকরা আছেন চরম অনিশ্চয়তায়। আর প্রায় ২৪ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক, যার মধ্যে অনেকেই ১০/১৫ বছর চাকরি করেও অস্থায়ীই রয়ে গিয়েছেন, তাদের বিষয়ে কোনো কথা নেই! ধরে নিই, স্থায়ী শ্রমিকরা তাদের সমস্ত পাওনা বুঝে পেলেন। পিপিপি বা লিজের ভিত্তিতে কখনও মিল চালু হলে, সেখানে তারা চাকরি পাবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? চাকরি পেলেও যে মজুরি পাবেন, তাতে সংসার চলবে কীভাবে? রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী (এবছর থেকে বাস্তবায়িত) একজন শ্রমিক সর্বনিম্ন ৮ হাজার ৩০০ টাকা বেসিক মজুরি, সবমিলিয়ে ১৪-১৫ হাজার টাকা মজুরি পাওয়ার কথা। অথচ বেসরকারি পাটকলগুলোতে শ্রমিকের বেসিক শুরু হয় মাত্র ২৭০০ টাকায়, সবমি-লিয়ে তারা ৫-৬ হাজার টাকার বেশি পান না। বেশিরভাগই দৈনিক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে। ‘নো ওয়ার্ক, নো পে’-এর ভিত্তিতে দৈনিকভিত্তিক একজন শ্রমিক পান ১৬৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা। চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই, নেই অবসরকালীন কোনো সুবিধা। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা মজুরি ছাড়াও পেনশন, গ্র্যাচুইটি, নিজের ও পরিবারের চিকিৎসা সেবা, মিলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ, খেলাধুলা ও বিনোদনের আয়োজনসহ নানা অধিকার ও সুবিধা ভোগ করতেন। বেসরকারি পাটকলে এসবের কোনো বালাই নেই।

পাটশিল্পের লোকসান কমানো নয়, বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য লুটপাট

সরকার বলছে, লোকসানী বলেই সরকারের পক্ষে এ পাটকল আর চালানো সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিমালিকদের হাতে দেওয়া হবে। যেন বেসরকারি খাতে দিলেই লাভজনক হবে। পূর্বের অভিজ্ঞতা কী বলে? লোকসানের কারণ দেখিয়েই গত কয়েক দশকে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা বন্ধ ও বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের ‘বেসরকারিকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রতিবেদন-২০১৩’ অনুযায়ী–১৯৭৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া ৬৪৪টি কারখানার মধ্যে ৪৫৮টি কারখানার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ১৮৬টি কারখানার, যার মধ্যে চালু আছে মাত্র ৯৬টি। ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন কারখানার কোনোটি খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করে আবাসন ব্যবসা চলছে। আবার কোথাও গড়ে তোলা হয়েছে দোকানপাট, বাণিজ্যিক ব্যবসা। বেশিরভাগ কারখানার বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, ট্যাক্স দীর্ঘদিন বাকি (২২ অক্টোবর ২০১৪, দৈনিক কালের কণ্ঠ)। যেমন–২০০৪ সালে বাওয়া জুট মিল বেসরকারিকরণ করা হয়েছিল। দেখা গেল, বাওয়া জুট মিলের মূল ক্রেতা মিলের যন্ত্রপাতি, গাছপালাসহ জমি বিক্রি করে দেয়। পরবর্তী মালিক বসুন্ধরা গ্রুপ মিলের জমি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় রূপান্তরিত করে। পিপিপি’তে দেওয়া পাটকলগুলোর শোচনীয় অবস্থাও আমরা দেখেছি।

বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পিপিপি প্রকল্পে চলছে। বিদ্যুতের ইচ্ছেমতো দাম নির্ধারণ, দুর্নীতি, লুটপাটের ফলে উল্টো প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। সোজা কথায়, পিপিপি(চচচ) মানে দাঁড়িয়েছে, পাবলিক মানি টু প্রাইভেট পকেট। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল হচ্ছে জনগণের সম্পদ, একে আজ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির মুনাফার জন্য তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন ব্যবসায়ীরা পিপিপি-তে যেতে চাইছে না। কারণ তাতে মিলগুলোর দায়দেনা তাদের বহন করতে হবে। তারা চাইছে ৯৯ বছরের লিজ। সরকারও পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে বলছেন, লিজ দেওয়া হবে। লিজ চাওয়ার কারণ, জমি পুঁজিপতিদের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় জিনিস। জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যাবে। ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকলে ১২০০ একরের মতো জমি, মিলের যন্ত্রপাতি, স্থাপনা মিলে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আছে। এই সম্পদের উপর নজর এখন লুটেরাদের।

পাট শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা

করোনা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার ফলে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে বিপুলভাবে। ইউরোপের ২৮টি দেশে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ হচ্ছে। ২০২২ সাল নাগাদ শুধু পাটের ব্যাগের বৈশ্বিক বাজার দাঁড়াবে ২৬০ কোটি ডলারের। পাট থেকে পলিমার ব্যাগ, ঢেউটিন, মিহিসুতা ভিসকস, পাট ও তুলা থেকে তৈরি কাপড় জুটন উৎপাদন সম্ভব। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এরই মধ্যে ২৩৫ ধরনের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছে। বিশ্বব্যাপী বিলাসবহুল মোটরগাড়ি, জাহাজ ও নির্মাণ শিল্পে পাটের বিশাল সম্ভাবনা আছে। করোনাকালে যেখানে অন্যান্য রপ্তানি পণ্য থেকে আয় কমেছে, সেখানে বিশ্বে চাহিদা বাড়তে থাকায় পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে। এ বছর জুলাই মাসে পাট খাত থেকে রপ্তানি আয় গত বছরের জুলাই থেকে ৩৮.২৩% বেশি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক বাজারের ১০ শতাংশও দখল করতে পারলে, শুধু এই পাট দিয়েই বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। চাল-গম-আটা-চিনিসহ ১৮টি পণ্যের মোড়ক ব্যবহারে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ২০১০ সালে প্রণীত আইন বাস্তবায়ন হলে দেশের বাজারেও পাটের বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হবে। আমাদের দেশে আছে উৎকৃষ্ট মানের পাটের জাত, উৎপাদনের জন্য উর্বর মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, গত পাঁচ দশকে গড়ে উঠা অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি। পাটশিল্পের যন্ত্রপাতি দেশে তৈরি ও মেরামত করা সম্ভব। অর্থাৎ, বিদেশ থেকে কিছুই আমদানি করতে হয় না। যেখানে গার্মেন্টস শিল্পের ৮০% কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণে ১৮০টা দেশের মধ্যে ১৭৯তম। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় পাট শিল্পের পরিবেশ দূষণ প্রায় নেই, বরং পরিবেশ বান্ধব। পাটের সাথে শিল্প ও কৃষি দুটোই যুক্ত। পাটকে কেন্দ্র করে এ দুই খাতেই বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। দেশে কর্মসংস্থান হলে দেশের তরুণ-যুবকদের কাজের সন্ধানে বিদেশ যেতে সাগরে ডুবে, বসনিয়ার জঙ্গলে, থাইল্যান্ডের গণকবরে জীবন দিতে হতো না। ফলে প্রয়োজন, পাটকে কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর বিকাশে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা।

পাটকলে লোকসান কেন

এখন প্রশ্ন, এত বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পাটকলে কেন লোকসান? বিজেএমসি’র রিপোর্টেই বলা হচ্ছে : রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর লোকসানের প্রধান কারণ–সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করতে না পারা। জুলাই-আগস্ট মাসে যখন কৃষকের হাতে পাট থাকে এবং পাটের দাম ১২০০-১৫০০ টাকা তখন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার পাট কেনার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয় না। আবার যখন পাট চলে যায় আড়তদারের কাছে এবং দাম মণপ্রতি ২২০০-২৫০০ টাকা হয়ে যায়, তখন পাট কেনার টাকা বরাদ্দ হয়। এতে কৃষকের লাভ হয় না মোটেই, কিন্তু কারখানার লোকসান হয় প্রচুর। এর দায় কার, শ্রমিকের না নীতি নির্ধারকদের? আবার প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ না করায় পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায় না। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর কোনো আধুনিকায়ন হয়নি। সবগুলো কারখানায় বেশিরভাগ তাঁতই বিকল ও পুরাতন হয়ে পড়ায় উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে তাঁত চালু ছিল মাত্র ৩৮%। ফলে চাহিদার অর্ধেকেরও কম কাঁচামাল আর ৩৮% সচল তাঁত দিয়ে উৎপাদন করে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো প্রতিযোগিতায় বেসরকারি পাটকল থেকে পিছিয়ে পড়ে। যার ফলে লোকসানের পাল্লা বেড়েছে। উৎপন্ন পাটপণ্যও গুদামে পড়ে থেকে নষ্ট হয়, মার্কেটিং হয় না। এর জন্য কি শ্রমিক দায়ী, নাকি ম্যানেজমেন্ট দায়ী?

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের পেছনে সরকারের বড় অজুহাত লোকসান। কিন্তু কেন লোকসান, কাদের কারণে লোকসান, লোকসান কাটাতে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল? পাটকলে লোকসানের প্রধান কারণ–১. সময়মত ও চাহিদামত পাট কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ না দেওয়া, ২. বেশি দামে নিম্নমানের পাট কেনা, ৩. মাথাভারী প্রশাসনের উচ্চ ব্যয়, ৪. ৫০-এর দশকের পুরনো তাঁত দিয়ে উৎপাদন করা, ৫. বিজেএমসি ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি-অদক্ষতা-দায়িত্বহীনতা, ৬. উৎপাদিত পণ্য মার্কেটিং করতে না পারা, ৭. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে লোকসান দেখিয়ে বেসরকারিকরণের সরকারি নীতি। লোকসানের জন্য দায়ী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কারও কি আজ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়েছে? লোকসানের কারণ দূর না করে জনগণের সম্পদ লুটপাটের আয়োজন করা হচ্ছে ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে।

পাটকল বন্ধ ছাড়া কি উপায় ছিল না?

২০১৬ সালে চীনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত পাট সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে সরেজমিনে পাটকলগুলো পরিদর্শন করে। তারা সুপারিশ করে মাত্র ২৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ করা যাবে। কিন্তু সরকার চীনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মতিপত্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পরে তা থেকে সরে আসে। আধুনিকায়নের জন্য সে বরাদ্দও আর করেনি। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক তাঁত স্থাপন করলে উৎপাদন বাড়বে তিনগুণ, শ্রমিকদের গড়ে ২৫ হাজার টাকা বেতন দিয়েও পাটকল লাভজনক করা সম্ভব।

সরকার বলে, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলে ৪৪ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, জনগণের টাকা এভাবে লোকসান কেন দেব? এভাবে দেখলে বিমান, রেল, বিআরটিসি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনেক খাত থেকে সরকারের লাভ হয় না, ভর্তুকি দিতে হয়। তাহলে কি এসব বন্ধ করে দিতে হবে? এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের তথ্যমতে অনেকগুলো কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রকে কোনো উৎপাদন না হওয়া সত্ত্বেও, সরকার মাত্র ৬ বছরে ৬২ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র ভাড়া দিয়েছে। সেগুলো তো বন্ধ করা হয়নি? লোকসানের কথা বলে ও শ্রমিকদের চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে গার্মেণ্টস মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়। এ টাকা কি জনগণের নয়? লোকসানের কথা বলা হয়, কিন্তু পাটকলগুলো ৪৪ বছরে সরকারকে কি পরিমাণ ট্যাক্স, বিদ্যুৎবিল, পানির বিল ইত্যাদি দিয়েছে–সে হিসেব দেওয়া হয় না। তারা শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য বাসস্থানের দায়িত্ব নিয়েছে, তারও অর্থংনৈতিক মূল্য আছে। সে তুলনায় প্রতি বছর লোকসানের পরিমাণ কত?

স্বাধীনতার পর ৭৭টি পাটকল জাতীয়করণ করে বিজেএমসি’র অধিভুক্ত করা হয়। ’৮১ সাল নাগাদ এই সংখ্যা হয় ৮২টি। সামরিক শাসক এরশাদ ক্ষমতায় বসে এই মিলগুলি বিক্রি ও বন্ধ করা শুরু করে। ২০০২ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজীকে বন্ধ করে দিয়েছিল মাত্র ১২০০ কোটি টাকা লোকসানকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৭-০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একের পর এক পাটকল বন্ধ করা হয়। পাটশিল্পকে লাভজনক করার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ৫টি পাটকল চালু করে সরকার বাহ্‌বা নিয়েছে, ‘পাট দিবস’ পালন ও ‘পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনা’র ঘোষণা দিয়েছে, পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি করেছে। কিন্তু সরকারি পাটকলের লোকসানের কারণ দূর করে লাভজনক করতে কোনো পদক্ষেপই তারা নেয়নি। বরং পরিকল্পিতভাবে বছরের পর বছর ধরে পাটকল শ্রমিকদের মজুরি-গ্র্যাচুইটি বকেয়া রেখে, সরকারদলীয় শ্রমিকনেতাদের দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা-সুবিধাবাদ ছড়িয়ে তাদের সংগ্রামী মনোভাব ধ্বংস করা হয়েছে। এখন তারা অনেকেই মনে করে–লস দিয়ে পাটকল আর চলবে না, তাদের পাওনা-বকেয়া দিলেই তারা খুশি।

পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের স্বার্থেই বিরাষ্ট্রীয়করণ

সরকার ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করে পাটকল বন্ধের উদ্যোগ নিল কেন? বিএনপি-জামাত জোট সরকার কেন আদমজী বন্ধ করেছিল?

এর পেছনে আছে সরকারগুলোর নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। পুঁজিবাদের বাজার সংকট কাটাতে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মতো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা মুক্তবাজার, বেসরকারিকরণের দাওয়াই দিচ্ছেন। বলছেন–‘রাষ্ট্র কেন ব্যবসা করবে? ব্যবসা করবে ব্যক্তি। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা, নোট ছাপানো, সীমান্ত রক্ষা এধরনের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করবে। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সেবাখাত বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। চাকরি দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। বাজারই সব ঠিক করবে।’ এটিই নয়া অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ। উদ্দেশ্য বেসরকারিকরণের মাতম তুলে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণের যতটুকু দেয়াল আছে তা তুলে দেওয়া, পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফা ও লুটপাটের মৃগয়াক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এ নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।

সাম্যবাদ পত্রিকার গত কয়েক বছরের সংখ্যাগুলোতে আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে একটি শক্তিশালী বড় পুঁজিপতিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সস্তা শ্রম ও পুঁজিপতিদের লুটপাটের অবাধ সুযোগ থাকায় বাংলাদেশে বিদেশি পুঁজিও আসছে। দেশি-বিদেশি এ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর আশীর্বাদেই অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে। তাদের খুশি রাখতেই নয়া উদারনৈতিক নানা অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে। তারই ফলাফল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ এবং ব্যবসায়ীদের লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। ফলে এটি বিচ্ছিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নয়, সম্ভাবনাময় পাটখাত পুরোটাই ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই অংশ। এ যেন সে প্রবাদটির মতো, ‘এ্ওড় শরষষ ধ ফড়ম, মরাব যরস ধ নধফ হধসব’। কুকুরটিকে মারতে হলে, পাগলা কুকুর বলে প্রচার কর। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা লোকসানী বানাও, এরপর রাষ্ট্রীয় টাকা অপচয়ের মায়াকান্না কেঁদে এ অজুহাতে বন্ধ কর!

ক্ষতি হবে সারা দেশের মানুষের

আজ যারা ভাবছেন, আমি তো পাটকলে চাকরি করি না, আমার কী? বা সরকার কাজটা ভালো করেনি, কিন্তু প্রতিবাদ করে লাভ কী? তাদেরকে বলি–পাটকল বন্ধই শেষ নয়! বিনা প্রতিরোধে, বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত যদি আজ সরকার সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে সরকার বস্ত্র-চিনি-ইস্পাত ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা যতটুকু এখনও টিকে আছে তা বন্ধ করবে। রেল-বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও হাত দেবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার যে এখনও কিছু দায়িত্ব নেয়, তাও ব্যবসায়ীদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে রেল-বিদ্যুৎ-গ্যাসের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আয়োজন চলছে। তার বাস্তবায়ন দেখছি, দফায় দফায় রেল ভাড়া-বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে। আজ খড়গটা পাটকল শ্রমিকদের উপর পড়ছে, আগামীকাল আপনার আমার উপর পড়বে। ফলে নিজের ও দেশের শোষিত মানুষের স্বার্থেই আজ পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি তুলতে হবে। আধুনিকায়ন করে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল চালু করার দাবি দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতি কার স্বার্থে পরিচালিত হবে–সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, না মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে–তার ভবিষ্যত গতিমুখ নির্দিষ্ট করার জরুরি প্রশ্নের সাথেও যুক্ত। তাই আমরা আহ্বান জানাই–পাট, পাটশিল্প ও পাটচাষি রক্ষার চলমান আন্দোলনে যুক্ত হোন, আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

ধর্ষক ও পৃষ্ঠপোষকদের রুখে দাঁড়ান

আর এখন পুঁজিবাদী সমাজে আরও বীভৎস রূপ নিচ্ছে। এভাবে আমাদের দেশে মানুষ আর মানুষ থাকছে না, আত্মকেন্দ্রিক এবং সমস্ত ধরনের মানবিকতা হারিয়ে ফেলছে। এই যে ভয়ঙ্কর কান্ড কোথা থেকে এটা হচ্ছে? শোষক শ্রেণির যে চেহারা, তারা যে লুটপাট করছে, সমস্ত ধরনের সামাজিক অন্যায়-অবিচার করছে, বড়লোক হচ্ছে – তা দেখে যুব সমাজের একাংশের মধ্যে আর কোনো বাঁধন নেই। তারা এসব দেখে ভাবছে – বাঁচতে হলে এই করতে হবে। লুটপাট করতে হবে, জবরদস্তি করতে হবে। যখন সমাজে অন্যায় চলে, তখন নারীর ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার আসে। কারণ নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষ মানুষের যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তা আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গড়ে ওঠেনি। আমেরিকা-ইউরোপে সমান অধিকারের ধারণা গড়ে উঠলেও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের দালাল রাজাকার-আলবদররা আমাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছিল, বিশেষ করে সংখ্যালঘু মেয়েদেরকে যে অত্যাচার করেছে, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এসময় যারা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে কিছুটা নীতি-নৈতিকতার ধারণা ছিল। দেশের স্বাধীনতার যে লড়াই সেটাই মানুষের মধ্যে এই নৈতিকতার ধারণা দিয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে এই পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হয়েছে। এরশাদ যে ছিল, সে মেয়েদের নিয়ে কী নোংরামি করেছে আপনারা জানেন। পুঁজিবাদের ভোগবাদী-ইন্দ্রিয়পরায়ণ অপসংস্কৃতির প্রভাবে সামাজিক অবক্ষয় বেড়েছে। প্রত্যেক সরকারের আমলেই সরকারী লোকেরা দেশের সবকিছু দখল করার পাশপাশি নারী ধর্ষণে যুক্ত হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রক্ষমতা দলীয় ও কায়েমী স্বার্থে তাদের রক্ষা করেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা আছে, তা চালু থাকলে মেয়েদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার আর উপায় নেই।

আসুন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আমি সমস্ত সেক্টরের মেয়েদের, সিনেমা-শিক্ষা-বিজ্ঞান সমস্ত সেক্টরের মেয়েদের এগিয়ে আসতে বলছি। আমরা জানি নারী-পুরুষ মিলেই একটা সমাজ। তাই সবাইকে বলছি প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে। আমি সমস্ত বাম-প্রগতিশীল শক্তিকে জনগণকে নিয়ে প্রতিরোধ করে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অপরাধকে আমরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে।

করোনা মহামারীতে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের কঙ্কালসার চেহারাটাই বেরিয়ে পড়ল

করোনা মহামারীর শিক্ষা, পরবর্তী কালের বিশ্ব পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে ‘সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)’ সংক্ষেপে এসইউসিআই(সি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁদের দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে গত ২৪ এপ্রিল অনলাইনে একটি আলোচনা করেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর এই মূল্যবান আলোচনার একাংশ কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে এখানে প্রকাশিত হলো। আমাদের বিশ্বাস, এই বক্তৃতা চিন্তাশীল পাঠককে জনজীবনে বর্তমান সংকটের কারণ বুঝতে ও পথের নিশানা পেতে সাহায্য করবে।

“... এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে যে মর্মন্তুদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে মানুষ এসে পড়েছে তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিশ্বে লক্ষ লক্ষ ঘরে আজ স্বজন হারানো কান্নার রোল। আমরা এই সভা যখন শেষ করব, তার মধ্যে করোনা আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা আরও হাজার হাজার বাড়বে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অনেকটা নিজের সাথে লড়াই করে আমাকে বলতে হচ্ছে।

... এই ব্যাপক সংখ্যায় মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়া এবং এই বিপুল সংখ্যক মৃত্যু–এটা কি অনিবার্য ছিল? আমি মনে করি নিশ্চয় তা নয়। যদিও এই রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ঘটেছে এবং এর প্রতিষেধক ও প্রতিবিধানের ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু এই রোগের লক্ষণ কী কী, কীভাবে অতি দ্রুত এই রোগ একজন ব্যক্তি থেকে বহু ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে কমিউনিটি মাস ট্রান্সমিশন বলা হয়, সতর্কতা হিসাবে কী কী ব্যবস্থা নিতে হয়, মাস ট্রান্সমিশন কীভাবে ঠেকানো যায়–এসবই রোগ শুরু হওয়ার একটু পর থেকেই জানা গেছে।

... চীনের কর্তৃপক্ষ এটাকে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধানের পরিবর্তে সেই ডাক্তারকে ধমক দিয়ে থামায়, অন্যায় করেছে বলে স্বীকারোক্তি করায় এবং খবরটা চেপে দেয়। ওই ডাক্তার কয়েকদিন বাদে এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। কেন চীন এই খবর চেপে দিতে চেয়েছিল? চীন ভেবেছিল বাইরে জানাজানি হলে অসুবিধা হবে, অল্পতেই এটা ম্যানেজ করতে পারবে।

... চীন এই উহান শহরকে লক ডাউন বা কাট আপ করে দেয়, যাতে এই রোগ সমগ্র চীনে না ছড়ায়। এটা করলেও চীন কিন্তু বিদেশের সঙ্গে তখনও এই শহরের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এটা জেনেই যে, অন্য দেশেও এইভাবে এই রোগ ছড়াতে পারে। বাণিজ্যিক ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য তা করেনি। এই না করাটা খুবই নিন্দনীয় অপরাধ। অথচ এটা করলে সমগ্র বিশ্বে এই রোগ এইভাবে ছড়াত না। এরোপ্লেন ও জাহাজের মাধ্যমে এই শহরের সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক তখনও স্বাভাবিক ছিল। সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল যে, উহান শহরে এই রোগে বিপুল সংখ্যায় লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু এটা জেনেও সাথে সাথে কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশ বাণিজ্যিক স্বার্থে উহান শহরের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেনি, নিজেদের দেশেও এই মারণ রোগকে মোকাবিলা করার জন্য কোনও প্রস্তুতি নেয়নি। এটাও মারাত্মক অপরাধ।

... আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় আমেরিকা শীর্ষস্থানে। এটা কি অনিবার্য ছিল? মার্কিন সরকার কেন ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করল? একদিকে চীনের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করতে চায়নি, অন্যদিকে নিজের দেশেও কলকারখানা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে চায়নি। আর এসবই করেছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থে। ঠিক একইভাবে ইতিমধ্যে এই রোগ ভয়ঙ্করভাবে ইউরোপের ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ নানা সাম্রাজ্যবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইসব দেশও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো ভূমিকা নেওয়ার ফলে সেখানেও হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের দেশে সমালোচনার মুখে পড়ে চীনকে দোষারোপ করে নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। কারণ কয়েকদিন পরেই আমেরিকায় নির্বাচন হবে। চীনের তুলনায় মার্কিন শাসকরা কম অপরাধী নয়। ভারত সরকারও এই রোগ সংক্রমণ রোধে সময়মতো কোনও প্রস্তুতি নেয়নি। যদিও ইতিমধ্যে চীন, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ইত্যাদি দেশে ওই রোগের আক্রমণ কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এটা তাদের অজানা ছিল না।

... ১৩ মার্চ ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, এটা কোনও সমস্যাই নয়, আমরা সতর্ক আছি। ভারতবর্ষের সরকার তখন প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার ভাঙা-গড়ার খেলাও চলছে। কংগ্রেসের এমএলএ-দের টাকা দিয়ে কিনে নিতে সমগ্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, বিজেপি নেতৃত্ব ব্যস্ত ছিল। এই রোগ নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় কোথায়! তাছাড়া চীনসহ সমগ্র বহির্বিশ্বের সাথে বিমান ও জাহাজ চলাচল পুরোদমে চালু রেখেছিল ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাণিজ্যিক স্বার্থে। তার ফলে বিদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক রোগাক্রান্ত মানুষ এদেশে চলে এল, যাদের সংস্পর্শে রোগ ছড়াতে লাগল।

... ২৪ মার্চ মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার গঠনের ষড়যন্ত্র সফল করতে পারল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার লকডাউন ঘোষণা করল। লকডাউন করেই দায় সারল, যেন এতেই রোগ ঠেকানো যাবে। বিদেশ থেকে আগতদের কোনও পরীক্ষা করা হল না, লকডাউন এলাকার মধ্যেও পাবলিকের পরীক্ষার কোনও বন্দোবস্ত হল না, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিট নেই, প্রয়োজনীয় হাসপাতাল ও বেডের ব্যবস্থা হল না, প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর নেই, ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই-র ব্যবস্থা করা হল না। অন্য দিকে লকডাউনের ফলে কোটি কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হল, গরিব মানুষ জীবিকাচ্যুত হল, পরিযায়ী শ্রমিকরা আশ্রয় ও কর্মচ্যুত হল–এদের কী করে চলবে, কী খাবে তার কোনও বন্দোবস্ত হল না। প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সংবাদমাধ্যমে নানা বাণী ঘোষণায় ব্যস্ত থাকলেন, যেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁদের আহার-নিদ্রা চলে গেছে! কে কত জনগণের ত্রাতা তা প্রমাণে ব্যস্ত হলেন আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে একদিন সারা দেশে হাততালি ও ঘণ্টা বাজানো এবং আরেক দিন ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে বাইরে মোমবাতি, টর্চ, মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে করোনা তাড়ানোর আজব বন্দোবস্ত করলেন। উদ্দেশ্য, একদিকে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট সুড়সুড়ি দিয়ে তা বাড়ানো, অন্য দিকে তাদের দল ও সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য সৃষ্টি করা।

> যে রোগ সংক্রমণ ঘটেছে চীন থেকে, শুরুতেই যদি চীন নিজ দেশে যেটা করেছে, বিদেশের ক্ষেত্রেও সেইরকম করত এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিও যদি সতর্ক হয়ে চীনের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করত, তাতে তাদের বাণিজ্যিক লাভের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হত ঠিকই, কিন্তু তাদের দেশে এই রোগের এই ব্যাপক বিস্তার ঘটত না, এত বিপুল প্রাণহানি ঘটত না। তাহলে এর জন্য কে দায়ী? এই ব্যাপক সংখ্যক আক্রান্ত এবং বিপুল হারে প্রাণহানি, এর জন্য কে দায়ী? এর জন্য দায়ী ভারতসহ সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের কর্ণধাররা। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। পুঁজিপতিদের কাছে মানুষের একমাত্র মূল্য শ্রমশক্তি হিসাবে, পুঁজিপতিদের শোষণযন্ত্রের উপকরণ হিসাবে

দেশের এত বড় দুঃসময়ে যথারীতি মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজও বিজেপি চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়তি সুযোগ পেয়ে গেল তবলীগ জামাতের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ধর্মান্ধ মুসলিমরা এটা করেছিল যথারীতি সরকারি অনুমতি নিয়েই। বিদেশ থেকেও এসেছিল সরকারি অনুমতি নিয়েই। অনুষ্ঠান বন্ধেরও কোনও নির্দেশ সরকার দেয়নি। এদের মধ্যে কয়েকজনের করোনা রোগ ধরা পড়ে এটা ঠিক। কিন্তু তারা কি এই রোগ ছড়ানোর জন্য এই অনুষ্ঠান করেছিল? তারা করেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য। যেমন প্রায় একই সময়ে তিরুপতিতে বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হয়েছে সরকারি অনুমতি নিয়েই। এর জন্য দায়ী যদি করতেই হয় তাহলে যে সরকার অনুমতি দিয়েছে, তাকেই দায়ী করতে হয়। অথচ সমগ্র দেশে বিষ ছড়ানো হচ্ছে এই বলে যে মুসলিমরাই করোনা রোগ নিয়ে এসেছে। একদিকে এটা করে যাচ্ছে যাতে আগামী দিনে এনপিআর-এনআরসি চালু করা সহজ হয়, অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী ও আরএসএস প্রধান সাধু সেজে বলছেন করোনার জন্য কোনও ধর্মকেই দায়ী করা উচিত নয়। এসব ভণ্ডামিও চলছে। এই দুঃসময়ে জনগণকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির, শাসক দলগুলির ও এদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজিপতিদের প্রকৃত চেহারা চিনে নিতে হবে।

ফলে এটাও বুঝতে হবে, যে রোগ সংক্রমণ ঘটেছে চীন থেকে, শুরুতেই যদি চীন নিজ দেশে যেটা করেছে, বিদেশের ক্ষেত্রেও সেইরকম করত এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিও যদি সতর্ক হয়ে চীনের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করত, তাতে তাদের বাণিজ্যিক লাভের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হত ঠিকই, কিন্তু তাদের দেশে এই রোগের এই ব্যাপক বিস্তার ঘটত না, এত বিপুল প্রাণহানি ঘটত না। তাহলে এর জন্য কে দায়ী? এই ব্যাপক সংখ্যক আক্রান্ত এবং বিপুল হারে প্রাণহানি, এর জন্য কে দায়ী? এর জন্য দায়ী ভারতসহ সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের কর্ণধাররা। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। পুঁজিপতিদের কাছে মানুষের একমাত্র মূল্য শ্রমশক্তি হিসাবে, পুঁজিপতিদের শোষণযন্ত্রের উপকরণ হিসাবে। তাই মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমিক হচ্ছে মনুষ্যদেহী কাঁচামাল, হিউম্যান ‘র’ ম্যাটেরিয়াল। কারখানা চালাবার জন্য যেমন কয়লা লাগে, সেই কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠিক তেমনই মানুষের শ্রমশক্তিও পুঁজিবাদ ব্যবহার করে, তার রক্ত শুষে নেয়, হাড়মাংস সব চূর্ণবিচূর্ণ করে শ্রমিকদের জীবন ছাই করে দেয়। এর ভিত্তিতেই পুঁজিবাদের শোষণযন্ত্র চলে। তাই কে বাঁচল, কে মরল এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

ফলে এই পুঁজিবাদ কত নিষ্ঠুর, নির্মম, অমানবিক – সেটা এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দিয়ে গেল। একইসাথে আমরা এটাও লক্ষ করে যাচ্ছি – বৈজ্ঞানিকেরা, পরিবেশবিদরা বারবার ওয়ার্নিং দিচ্ছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। এন্টার্কটিকা ও মেরুঅঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে, হিমালয়ের গ্লেসিয়ার ধ্বংস হচ্ছে, যার ফলে নদীগুলির জলের উৎসও ধ্বংস হচ্ছে। এ সবের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। এটা মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। পরিবেশবিদরা বারবার বলছেন, গ্রিনহাউস গ্যাস কন্ট্রোল কর, ফসিল অয়েল ব্যবহার কমাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাভের স্বার্থ, ওয়ার ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থ তারা কন্ট্রোল করতে কেউ রাজি নয়। মানবসভ্যতা বিপন্ন হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের মুনাফার স্বার্থে আঘাত দেওয়া চলবে না। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। ঠিক সেই একই জিনিস এই রোগের ক্ষেত্রেও দেখা গেল।

আরেকটা জিনিসও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এই পুঁজিবাদী দেশগুলির অবহেলা কী নির্মম! প্রত্যেকটা দেশেই দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল নেই, হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, পরীক্ষার কিট নেই, ভেন্টিলেটর নেই, পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যা দরকার, তা নেই। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক হাসপাতাল থাকত, বেড থাকত, তাহলে এত মৃত্যু ঘটত না। এমনকী ডাক্তার-নার্সও মারা যাচ্ছেন। এর কারণ কী? এর কারণ স্বাস্থ্য বাজেট সব দেশেই সঙ্কুচিত। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গুরুত্ব দেয় মিলিটারি বাজেটের ওপর। গত বছর সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থানে, চীন দ্বিতীয় স্থানে এবং ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থানে ছিল। সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই সামরিক উৎপাদন প্রবলভাবে বাড়াচ্ছে, এর জন্য অঢেল ব্যয় করছে, বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাকে সঙ্কুচিত করছে, বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কারকে ব্যাহত করছে। স্বাস্থ্যের জন্যও যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চর্চা দরকার, তার চর্চা, তার বিকাশকে ব্যাহত করছে। এই বিজ্ঞান চর্চা এভাবে ব্যাহত না হলে হয়তো অতি দ্রুত এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার হতে পারত। এগুলো অবহেলা করা হয়েছে।

...আপনারা জানেন, এমনিতেই বিশ্বে মন্দা চলছিল। ওরা মন্দার পরিবর্তে বলছিল স্লোয়িং ডাউন অফ ইকনমি। বাস্তবে মন্দাই চলছিল। গত বছরই আমাদের দেশে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ছোটবড় কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ১০ কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিল। এগুলি সরকারি হিসাব। বিভিন্ন দেশে একই অবস্থা চলছিল। কবে করোনার আক্রমণ থামবে জানা নেই। ইতিমধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকায় দাবি উঠেছে, আমাদের দেশেও উঠছে, এমনিতেই অনাহারে মরছি, ফলে লকডাউন তুলে নাও। মালিকরা চাইছে মুনাফার স্বার্থে, শ্রমিকরা চাইছে, গরিব মানুষ চাইছে পেটের জ্বালায়।

এই ব্যাধির আক্রমণ যখন থামবে তখন আমরা একটা নতুন বিশ্ব দেখব। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৯৩০ সালে একটা মহামন্দা এসেছিল। তার চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর মন্দা আসছে। অজস্র কলকারখানা বন্ধ, কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ পথেঘাটে মরছে, ভুখা মিছিল–গোটা বিশ্বে এই চেহারা ঘটবে। এই একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে, শক্তির ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটবে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বে আমেরিকা ছিল একনম্বর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় ছিল জাপান। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানকে হটিয়ে চীন এসে গেছে দ্বিতীয় নম্বরে। চীন এবং আমেরিকার প্রবল বাণিজ্য যুদ্ধ চলছিল সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে কে কোথায় কতটা লুণ্ঠনক্ষেত্র দখল করবে, কে কোথায় কতখানি আধিপত্য বিস্তার করবে – এই নিয়ে। ইতিপূর্বে দুটি বিশ্বযুদ্ধ একই কারণে ঘটেছে। এখন বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে। অস্ত্রের আক্রমণ না থাকলেও এতে বহু কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে অনাহারে মরছে। চলতি কথায় আছে, হাতে না মেরে ভাতে মারছে। করোনা পরবর্তীকালে চীন আরও শক্তি সঞ্চয় করে আসছে। ইতিমধ্যেই চীন এই সুযোগে ইউরোপে কলকারখানা কিনছিল, পুঁজি বিনিয়োগ করছিল। ভারতেও কিছু শেয়ার কিনেছে, আরও কিনতে যাচ্ছিল। এইভাবে সে তার আধিপত্য বিস্তার করছিল। ভারত সরকার আইন করেছে চীন যাতে বিনা অনুমতিতে শেয়ার বা কারখানা কিনতে না পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও আতঙ্কিত হয়ে একই সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু চীন ধীরে ধীরে থাবা বিস্তার করছে নানা জায়গায়। তার উৎপাদন শিল্পগুলি অক্ষত রয়েছে। অন্যান্য দেশে লকডাউন চলছে। চীনে এখন লকডাউন নেই। ফলে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সে বাজার গ্রাস করছে। এমনকি যে কিট সে বিক্রি করেছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি, কাজ দিচ্ছে না। ইউরোপ তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ভারত সরকারও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছে। এরপর হয়ত দেখা যাবে চীন একনম্বর সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে–যেটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই হতে দিতে চাইবে না। তার ফলে চীন ও আমেরিকার প্রচণ্ড লড়াই হবে এই নিয়ে, সেটা শেষপর্যন্ত বাণিজ্য যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। ট্রাম্প যে আমেরিকায় দ্রুত লকডাউন তুলতে চাইছে তার কারণ আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রি যদি পিছিয়ে যায় তাহলে চীনের আধিপত্য বাড়বে – এই তার উদ্বেগ। এটাও তার পুঁজিবাদী স্বার্থ, জনগণের স্বার্থের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আবার লক্ষ করুন, করোনা রোগের আক্রমণে সব দেশই আক্রান্ত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রত্যেকের মধ্যে মুনাফা ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব এত প্রবল যে এই রোগের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াচ্ছে না, সকলের বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করছে না,

● ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উপমহাদেশে সেক্যুলার মানবতাবাদের পথিকৃৎ

[এবছর ২৬ সেপ্টেম্বর ছিল ভারতীয় নবজাগরণে সেক্যুলার মানবতাবাদী ধারার পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের(১৮২০-১৮৯১) দ্বিশতজন্মবার্ষিকী। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ধর্মান্ধতা-কুসংস্কারে ডুবে আছে, সেই সময় বিদ্যাসাগর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে জীবনবোধকে প্রদীপ্ত করার অসমসাহসী কাজ শুরু করেছিলেন। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ছিল তাঁর কাছে সামগ্রিক সমাজ সংস্কারের প্রবেশদ্বার। গোটা সমাজের গোড়ামির বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি নারী শিক্ষা, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি দরদবোধ বিশেষত নারী সমাজের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অনন্য। যুক্তি ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে তাঁর যে উপলব্ধি ও জীবনদর্শন, তার সাথে অভিন্ন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র। এই মহান মানবতাবাদী মনীষীর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীতে তাঁর চরিত্র, আপোষহীন ও নীতিনিষ্ঠ জীবনসংগ্রাম, সমাজ সংস্কারে তাঁর উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।]

করোনার মধ্যে দেশে ঘূর্ণিঝড় ও এক অংশে বন্যা দেখা দিল। অনেকে বললেন–আমাদের কপালই এমন, আল্লাহর গজব আমাদের ওপর পড়ছে। এসব আমাদের পাপকর্মের ফল। কিন্তু আল্লাহ কেবল আমাদের ওপর গজব দিলেন কেন? বিধর্মী ইউরোপ আমেরিকার উপর তো দিলেন না? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী 'মিসিসিপি' প্রতি বছর কেন আমেরিকাকে ডুবায় না? পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদী 'রাইন' কেন প্রতি বছর জার্মানকে বানের জলে ভাসিয়ে দেয় না? সরকার নদী ড্রেজিং করে দুই তীরের পরিচর্যা করে বা বাঁধ দিয়ে বন্যা থেকে স্থায়ীভাবে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। এটা মানুষ বুঝতে পারলে শাসকদের বিপদ। শাসকদের জন্য জনগণের ধর্মবোধটা খুব কাজে লাগে। তাই যুগে যুগে শাসকরা বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রসারে বাঁধা দেয়, জনগণের মধ্যে অধ্যাত্মবাদী চিন্তা, কুসংস্কার, কপাল নির্ভরতার প্রসার ঘটায়। যাতে জনগণের মধ্য অধিকারবোধ তৈরি না হয়।

এই ধর্মটা সবসময় সবদেশে একরকম ছিল না। মানুষকে দাস যুগে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে ধর্ম বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। ইসলাম ধর্মের নবীর বেলালকে দাসত্বমুক্ত করে আজানের দায়িত্ব দেওয়ার কথা সকলের জানা। খ্রিস্ট ধর্মেরও বিরাট ভূমিকা আছে দাস ব্যবস্থা ভাঙার সংগ্রামে। সে সময় মানুষ ধীরে ধীরে বহুঈশ্বরবাদিতা থেকে একেশ্বরবাদিতায় এসেছে। তখন সমাজে শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মের বিরাট ভূমিকা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সামন্ত জমিদারি সমাজ ও রাজতন্ত্র থেকে বের হয়ে মানুষ যখন আধুনিক গণতান্ত্রিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে আসলো, তখনই আসলো ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক চিন্তা জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলে আর মধ্যযুগীয় ধর্মচিন্তা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কথা বলে। সেক্যুলার মানবতাবাদ জন্ম নেয়। এই মানবতাবাদের মূল কথা হলো–'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। এই যে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি মুক্তি, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র–এসব ইউরোপে যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে আমরা ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলেছি।

এর প্রথম ঢেউ ভারতবর্ষে লাগে রাজা রামমোহন রায়ের মাধ্যমে। তিনি ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন। তার মানবতাবাদী চিন্তা ধর্মীয় চিন্তার সাথে মিশে ছিল। তার পরেই ভারতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তা ইউরোপ থেকেই নিয়ে আসেন। আমরা তা বুঝতে পারিনি বলে এই বন্যার প্রকৃত কারণ, শ্রমিকের কপাল খারাপ নাকি পুঁজিপতি সৃষ্ট দুর্দশা–এসব নিয়ে আজও আমরা অন্ধকারেই আছি। ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের বড় মানুষের চরিত্র থেকে যদি শিখতে চাই তাহলে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করতেই হবে। 'রাজা রামমোহনের অভ্যুত্থান এ দেশের নব জাগরণের ইতিহাসে অনেকটা উষাকালের মতো–রাত্রির অন্ধকার অপসৃয়মান, তখনো সূর্যোদয় ঘটেনি, কিন্তু পূর্বদিগন্তে তারই রক্তিম পূর্বাভাস। আর বিদ্যাসাগর হচ্ছেন কয়েক হাজার বছরের অন্ধকার ভেদ করে প্রথম রক্তিম সূর্যোদয়।'

মানুষ চিনতে চোখ লাগে, অন্য কথায় একটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে বড় মানুষ সম্পর্কে বিচারধারাও সঠিক হয় না। বিদ্যাসাগরকে বিচার করতে গিয়ে কেউ বিদ্যার সাগর, কেউ দয়ার সাগর, কেউ করুণার সাগর বলেছেন। তা দিয়ে কি বিদ্যাসাগরের সাথে দাতা হাতেম তাঈ বা হাজী মোহাম্মদ মুহসীনের পার্থক্য বোঝা যায়? সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক, বিধবা বিবাহ প্রবর্তক, বাল্য বিবাহ-বহুবিবাহ নিবারক ইত্যাদি নানাভাবে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করা হয়েছে–যার সবগুলিই সত্য বটে এবং আজকের দিনে দুর্লভও বটে। কিন্তু এ সবের কোনোটাতেই তাঁর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হয় না। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা মিশে ছিল। সেখানে বিদ্যাসাগরই প্রথম ভারতবর্ষে সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তার জনক হিসাবে আবির্ভূত হন। এটাই হলো বিদ্যাসাগরকে সঠিকভাবে বোঝার সবচেয়ে বড় দিক।

এ প্রসঙ্গে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, ভারতবর্ষের এসইউসিআই(সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে প্রজ্ঞাদীপ্ত মূল্যায়নের একটি অংশ স্মরণীয় :

"... বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁ আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদুর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে একটা ব্রেক ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। ... একথা ঠিক, বাইরে তাঁর শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের বেশই ছিল। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি 'হিউম্যানিস্ট'। ... তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হলো–বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ছেদ, যিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ সত্য তাঁর সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।..." (কমরেড শিবদাস ঘোষ, নির্বাচিত রচনাবলী : তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪১৬-১৭)

শিক্ষাক্ষেত্রে টোলকেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে আধুনিক স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সেক্যুলার পাঠ্যক্রম চালুর ক্ষেত্রেও তিনিই অগ্রণী। বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক। বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তকে তিনি বাংলা বর্ণমালার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে তাঁর কিছু সাহিত্যসম্ভার। দুর্বোধ্য বাংলা ব্যাকরণকে সহজবোধ্য করে তিনি 'কৌমুদি' রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেব সরকারের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে সুপারিশ করেন যে, কলেজে যেন বিশপ বার্কলে রচিত দর্শন পুস্তক 'ইনকোয়ারি' পড়ানো হয়। নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর এতে আপত্তি করে বলেন, বার্কলের দর্শন ভ্রান্ত, শুধু তাই নয়, দেশীয় দর্শন সাংখ্য-বেদান্তও ভ্রান্ত। এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ, আজকের দিনে সম্ভব না। ছাত্র-ছাত্রীদের মিলের লজিক পড়ানো দরকার, ইংরেজি ভাষা চর্চা দরকার বললেন।

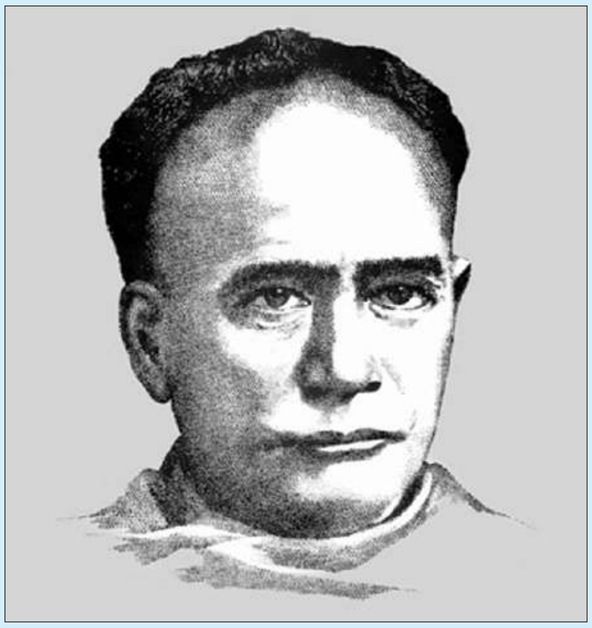

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁ আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদুর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে একটা ব্রেক ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। ... একথা ঠিক, বাইরে তাঁর শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের বেশই ছিল। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি 'হিউম্যানিস্ট'। ... তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হলো–বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ছেদ, যিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিচার-বুদ্ধি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ সত্য তাঁর সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।..." (কমরেড শিবদাস ঘোষ, নির্বাচিত রচনাবলী : তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪১৬-১৭)

বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের রচিত 'জীবনচরিত' পুস্তকে বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, নিউটনের জীবনী লিখেছেন। ডুবাল, জেনঙ্কেসরা গরিব অবস্থা থেকে কীভাবে লড়াই করে পড়াশুনা করে বড় হয়েছেন এসব কাহিনী লিখে পড়িয়েছেন যাতে ছাত্ররা এসব চরিত্র থেকে অনুপ্রেরণা পায়। ইংল্যান্ডে প্রকাশিত 'দ্যা রুডিমেন্টস অব নলেজ' নামের পুস্তক অবলম্বনে বিদ্যাসাগর তার 'বোধোদয়' রচনা করলেও সে পুস্তকের ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কিত অংশ বোধোদয় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রবল আপত্তির মুখে সরকার মি. মার্ডক নামে একজনকে তদন্ত করতে পাঠান। তিনি রির্পোট করেন–বিদ্যাসাগর লিখেছেন মানুষ মারা গেলে সৎকার হয়, কিন্তু তিনি একথা লেখেননি যে আত্মা অবিনশ্বর। কারণ তিনি আত্মা মানতেন না, তাঁর লেখার কোথাও ভগবানের পূজা এসব আনেননি। মার্ডক বলেছেন–বিদ্যাসাগরকে যে হিন্দুসংস্কারক বলা হয় তা ঠিক নয়। তিনি কোথাও হিন্দুধর্মীয় কোনো আন্দোলনে নেই, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে নেই, তিনি হচ্ছেন সমাজ সংস্কারক। ইংল্যান্ডের রবার্ট ওয়েন-সেন্ট সাইমন যেমন সেক্যুলার, বিদ্যাসাগরও তাই।

বিদ্যাসাগর এফ জি ময়েট-এর কাছে লেখা পত্রে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের গোড়ামি সম্পর্কে বলছেন, "আরব সেনাপতি আমর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফা ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল–আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে। খালিফা উত্তর দিলেন, গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না হয় বিরুদ্ধে। যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট, আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ঐগুলি ধ্বংস কর। আমার বলিতে লজ্জা হয়–ভারতীয় পন্ডিতগণের গোড়ামি ঐ আরব খালিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়।"

বিদ্যাসাগর সে যুগে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের সে যুগটাই ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদের যুগ। বেকন, হব্স, লক, স্পিনোজা'দের বক্তব্য নিয়ে তখন ইউরোপে বস্তুবাদের জোয়ার চলছে। বস্তুবাদকে ভিত্তি করে কান্টের অজ্ঞেয়বাদ, ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ এসব এসেছে। এসব চিন্তার সাথে বিদ্যাসাগরের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, ঈশ্বর মানতেন না, দেবতা মানতেন না, পূজো-আর্চায় বিশ্বাস করতেন না, তবুও এদেশে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। অথচ সে সময় এ দেশে গভীর বিশ্বাস ছিল–ঈশ্বর না মানলে, ভগবান না মানলে চরিত্র হয় না, বড় মানুষ হয় না। আজও এই ধারণা সমাজে প্রবলভাবে আছে।

সমাজের কল্যাণ কামনাই ছিল বিদ্যাসাগরের কাছে পরম ধর্ম। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন, "চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি-জরা-মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুঁজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে–এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে, স্বর্গ চাইনা, মোক্ষ চাই না, বারে বারে ফিরে আসি এই মর্ত বাংলায়।"

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বহু বিবাহ বন্ধের আন্দোলনে যখন তিনি নামলেন তখন এমন কি অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকেরাও বিদ্যাসাগরের তীর্যক সমালোচনা করেছেন। সমাজকে জয় করতে নানা ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্র ঘেঁটে তিনি বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসে লিখেন, "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলকাতায় কে নাকি বড় পন্ডিত আছেন তিনি বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পন্ডিত, তো মূর্খ কে?" এক চাটুকার ভেবেছিল, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ, ফলে বিদ্যাসাগরকে বঙ্কিমবিরোধী কথা বললে ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে। তাই সে বলল, "জানেন তো বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র সারাদিন ইংরেজদের অধীনে ডেপুটিগিরি করে আর রাতে মদ বাঈজি নিয়ে থাকে।" বিদ্যাসাগর তাকে হতাশ করে বললেন, "বল কি, তাহলে ত তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সারাদিন অফিসের কাজের পর রাতে এসব করে, রপরও এত সুন্দর বই লেখে কি করে?" এই হলেন বিদ্যাসাগর।

আবার যথার্থ আত্মমর্যাদার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত যখন সহকারি সেক্রেটারি হিসাবে তার পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন না, তখন তিনি পদত্যাগ করলেন। রসময় দত্ত পরিচিত একজনকে দিয়ে বলালেন, চাকুরি যে ছেড়ে দিল চলবে কি করে ? বিদ্যাসাগর দৃঢ়ভাবে বললেন, "বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে খাবে, মুদি দোকান করে খাবে, যে চাকরিতে সম্মান নেই তা করবে না।" আরেকজনকে বলছিলেন, "আমি নুন ভাত খাব, দু'বেলার জায়গায় একবেলা খাব, একদিন অন্তর একদিন খাব, কিন্তু আত্মমর্যাদা বিক্রি করবো না"। ক'জন আজ এভাবে বলতে পারে!

তিনি এমনকি পারিবারিক জীবনেও কখনো নীতি-আদর্শের সাথে বিন্দুমাত্র আপোস করেননি। নিজের ছেলে যখন বিধবা বিবাহ করতে সম্মত হলো, তখন তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করলে আত্মীয়রা দেশাচারের কথা তুলে আপত্তি জানান। তিনি সাফ জানালেন তিনি দেশাচারের দাস নন। আত্মীয়রা বিগড়ে যাবেন বলে তিনি পিছপা হননি। আবার সেই ছেলে যখন পরবর্তীতে সেই স্ত্রীকে অসম্মান করতে লাগলো, তখন ছেলেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এ নিয়ে নিজের স্ত্রীর সাথেও বিদ্যাসাগরের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মেয়ের জামাই সূর্য্যকুমার অধিকারী মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি টের পেলেন ফান্ডের তিন চার হাজার টাকার হিসাব গরমিল। সাথে সাথে জামাইকে ডেকে তিরস্কার করে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনি যা সত্য বলে জীবনে গ্রহণ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে দৃঢ়ভাবে পালন করেছেন।

আমরা ক'জন আজ এই মূল্যবোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারব? এই প্রশ্নের মীমাংসা নিজের মধ্যে করতে পারলে আমরা বিদ্যাসাগরকে যথাযথভাবে স্মরণ করতে পারব এবং দেশকে একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারব। পারব নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনগণের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে।

[তথ্যসূত্র : কমরেড প্রভাস ঘোষ রচিত 'ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-একটি মার্কসবাদী মুল্যায়ন' পুস্তিকা অবলম্বনে রচিত।]

শহীদ রুমী দিবস পালন

শহীদ রুমী বাংলাদেশের তারুণ্যের কাছে একটি স্পর্ধার নাম। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম তাঁর বিখ্যাত বই 'একাত্তরের দিনগুলি'-তে রুমী ও তাঁর বন্ধু, যারা ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য, তাদের একাত্তরের লড়াইয়ের অগ্নিঝরা ছবি এঁকেছেন। ছাত্র ফ্রন্ট সারাদেশে এই সংগ্রামী তরুণদের জীবন পৌঁছে দিতে চায় এবং সাহস ও সংগ্রামের জাগরণ তৈরি করতে চায়। ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট রুমী ও ক্র্যাক প্লাটুনের অনেক সদস্যকে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তানি মিলিটারি। পরে প্রায় সবাইকেই হত্যা করা হয়। রুমীও আর ফিরে আসেনি। গত ৩০ আগস্ট রাত ৮টায় রুমী ও সেই বীর শহিদদের স্মরণে ছাত্র ফ্রন্টের অনলাইন আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, শহীদুল্লাহ্ খান বাদল, এএফএম আবদুল হ্যারিস। তাঁদের সাথে ছিলেন শহিদ রুমীর ছোটভাই সাইফ ইমাম জামি ও শহিদ বদিউল আলমের ছোটভাই সাইফুল আলম। তাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় একাত্তরের স্মৃতিচারণে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এদিন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুমীর ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। সারাদেশের অর্ধশতাধিক স্থানে ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে শিক্ষার্থীরা রুমীকে ও ক্র্যাক প্লাটুনের শহিদদের স্মরণ করে, শ্রদ্ধা জানায়।

কৃষক ফ্রন্টের পরিবর্তিত নাম 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন'

বাসদ(মার্কসবাদী)-র কৃষক সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন'। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের এক অনলাইন সভায় সর্বসম্মতিতে নাম পরিবর্তন করা হয়। ক্ষেতমজুর ও কৃষক নেতা আলমগীর হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। প্রতিনিধি সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্তে বলা হয়–১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের নেতৃত্বে দেশের কৃষি ও ক্ষেতমজুর কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনের বর্তমান স্তরে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ কৃষকআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের পূর্বতন নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন' রাখা হয়েছে।

প্রতিনিধি সভায় কমরেড আলমগীর হোসেন দুলালকে আহ্বায়ক এবং আহসানুল হাবীব সাঈদ, হাসিনুর রহমান, মহিউদ্দিন মহির, আনোয়ার হোসেন বাবলু, গোলাম সাদেক লেবু, জি এম বাদশা ও আহসানুল আরেফিন তিতুকে সদস্য করে ৮ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

হেলথ সার্ভিস ফোরাম, সিলেট এর উদ্যোগে 'করোনাকালীন চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি ২০২০'

করোনাকালীন সময়ে হেলথ সার্ভিস ফোরাম, সিলেট-এর উদ্যোগে সিলেটের তিনটি এলাকায় একটি চিকিৎসা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। হেলথ সার্ভিস ফোরাম, সিলেট এর সংগঠক ডা. ফাতেমা ইয়াছমিন ইমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এসকল ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতা করেছে সিলেট কিডনী ফাউন্ডেশন, চাইল্ডহুড ফ্র্যান্ডস্ চ্যারিটিসহ প্রভৃতি সংগঠন।

বাম জোটের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাওয়ে পুলিশি হামলা

বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয় পাটকল চালু ও আধুনিকায়ন করার দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ৫ অক্টোবর ২০২০ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে এক বিশাল মিছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঘেরাও-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শাহবাগ মোড়ে দুইদফা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে অগ্রসর হলে শেরাটন মোড়ে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ পুনরায় ব্যারিকেড দিয়ে দুই দিক থেকে মিছিলকে ঘিরে ফেলে। মিছিলটি ব্যারিকেড ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশী হামলা, লাঠিচার্জ ও নারী কর্মীদের লাঞ্ছিত করে। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ১৯ অক্টোবর রাজপথ অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে মিছিল সমাপ্ত হয়। ঘেরাও মিছিল পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জোটের কেন্দ্রীয় নেতা সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী কমরেড জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড জহিরুল ইসলাম, লতিফ জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সুলতান মৃধা ও করিম জুট মিলের শ্রমিক মো. গোফরান। সমাবেশ পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির নেতা শহিদুল ইসলাম সবুজ।

শিক্ষা দিবসে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ বছরের বেতন-ফি ও মেস ভাড়া মওকুফে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ, জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ২৫ শতাংশ ও স্বাস্থ্যখাতে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত, সরকারি উদ্যোগে সকল করোনা রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিতের দাবিতে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ারের সভাপতিত্বে এবং প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদের পরিচালনায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জাহেদা বেগমের জীবনাবসান

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলার সহ-সভাপতি জাহেদা বেগম লিনা গত ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এর আগে দীর্ঘদিন তিনি হার্টের রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫০ বছর।

জাহেদা বেগম লিনা ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র একজন দরদী সমর্থক এবং বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার সহসভাপতি। তাঁর জীবনসঙ্গী গাইবান্ধা জেল পার্টি আহ্বায়ক আহসানুল হাবিব সাঈদের হাত ধরে তিনি পার্টি রাজনীতিতে যুক্ত হন। গাইবান্ধার মত রক্ষণশীল গ্রামীণ এলাকায় একজন গৃহবধূ হয়েও সাহসের সাথে তিনি পার্টির সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নারীর প্রতি সহিংসতায় প্রতিবাদমুখর, নানা উদ্যোগে কখনো সক্রিয় কখনো বা নীরব অংশগ্রহণে সহযোগিতা করেছেন। সংগঠনে অনেক কর্মী আছেন যারা নীরবে প্রেরণা যোগায়, উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ এগিয়ে নেন–এমন মানুষ ছিলেন কমরেড জাহেদা বেগম লিনা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পার্টির নেতা কর্মীদের সেবা-যত্ন, খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কমরেড জাহেদা বেগম লিনা, লাল সালাম! তোমার সংগ্রাম নিপীড়িত নারীদের বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগাবে! বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৫ আগস্ট ১১টায় গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাহেদা বেগম লীনার শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভায় তাঁর জীবনস্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য-পরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক, জেলা আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য প্রভাষক কাজী আবু রাহেন শফিউল্যাহ খোকন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্ত, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলমগীর কবির বাদল, জেলা বাসদ সমন্বয়ক গোলাম রব্বানী, কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগের জেলা সভাপতি মোস্তফা মনিরুজ্জামান, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী) জেলা সভাপতি রেবুতি বর্মন, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বাবু, উদীচী জেলা সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল গণি রিজন, দারিয়াপুর সাংস্কৃতিক জেটের সভাপতি প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক রেজা, শিক্ষক ফারুক আকন্দ, শিক্ষক মোজাম্মেল হক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সংগঠক উম্মে নিলুফার তিন্নি প্রমুখ। শোকসভায় বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র জেলা সাধারণ সম্পদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী'র সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুভাষিনী দেবী। এর আগে সভার শুরুতে জাহেদা বেগম লিনা'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ স্থানান্তরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ পৌরসভার বাইরে স্থানান্তরের চক্রান্তের প্রতিবাদে ১২ সেপ্টেম্বর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি গাইবান্ধা জেলার সাধারণ সম্পাদক কাজী আবু রাহেন শফিউল্লা খোকন। গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ পৌরসভার বাইরে স্থানান্তর করা হলে মেয়েরা নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে, তাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে, কলেজের সামনে বখাটেদের উৎপাত বেড়ে যাবে। ফলে তারা স্বাভাবিকভাবে কলেজে যেতে পারবে না, তাদের লেখাপড়ায় বাধা সৃষ্টি হবে। পৌরসভার ভিতরে কলেজ স্থাপনের মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে। সেখানে কলেজ স্থাপন করলে মেয়েরা নিরাপত্তা পাবে।

রৌমারীতে ব্যাটারিচালিত রিক্সা শ্রমিকদের বৈঠক

ধর্ষণ : কেন বাড়ছে? প্রতিকারের পথ কী?

নিয়ে জন্ম নিয়েছিল? এরা কি কয়েকজন খারাপ ছেলে?

এদের জন্ম দিয়েছে এই সমাজ, এই রাষ্ট্র। এটা সেই রাষ্ট্র যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক দিনের পর দিন উপবাসে থাকে। দেশে ৪ কোটি বেকার। এই বেকার যুবকরা নৌকা নিয়ে উন্মত্ত সাগর পাড়ি দেয় কাজের সন্ধানে। মাঝসমুদ্রে নৌকা ডুবে মারা যায়, ঘরের ছেলেদের সারি বাঁধা কবর খুঁজে পাওয়া যায় থাইল্যান্ডের জঙ্গলে। কলমের এক খোঁচায় পাটকলের হাজার হাজার শ্রমিক রাস্তায় বসে যায়, তারা জানে না কোথায় যাবে, এমনকি ন্যায্য বকেয়া পর্যন্ত তারা পায় না। দিবারাত্রি অমানুষিক খেটে বেঁচে থাকার মজুরি জোগাড় করতে পারছে না গার্মেন্টস শ্রমিকরা, মরছে ফ্যাক্টরির মধ্যে আটক অবস্থায় আগুনে পুড়ে কিংবা বাতিল হয়ে যাওয়া ভবনের তলায় চাপা পড়ে। দুর্ঘটনা নিশ্চিত জেনেও তাদের কাজে যেতে হয়, কারণ কাজ না করলে না খেয়ে মরতে হবে। হাহাকার চারিদিকে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। টঙ্গীর গার্মেন্টস শ্রমিক থেকে গাইবান্ধার গ্রামের কৃষক–কে নেই এই কাতারে? দাম না পেয়ে সবজি রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে কৃষক, দুধ ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে খামারি। দুধের শিশুকে বিক্রি করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছে দরিদ্র মা। শহরের রাস্তায়, রেল স্টেশনে, ফুটপাতে হাজার হাজার পরিবার। শিশু জন্ম নিচ্ছে ও বেড়ে উঠছে রাস্তায়। এরা জানে না মায়ের স্নেহ কী, বাবার আদর কী। ভালবেসে এদেরকে কেউ কাছে টানেনি, আদর করে মান ভাঙায়নি। অভিমান করার কোনো অধিকারই সমাজ তাদের দেয়নি। তারা মায়ের কাছে খেলনার বায়না করে কাঁদে না, ভাত চেয়ে কাঁদে।

এটা বাংলাদেশের একটা চিত্র। একদিকে এই অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, গৃহহীন, বস্ত্রহীন বাংলাদেশ; আর একদিকে বিরাট জৌলুসের বাংলাদেশ। যেখানে কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধির হারে সে গোটা পৃথিবীতে প্রথম। পাঁচতারা হোটেলে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের সম্মিলনে হাজার হাজার কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট হয়, না খেয়ে খাটা শ্রমিকের বেতন বাড়ে না। কন্ট্রাক্ট সাইন শেষে ডিনার করে মালিকরা বাড়ি যান, ডিনারের প্রতি প্লেটের মূল্য শ্রমিকের মাসের বেতনকে ছাড়িয়ে যায়। শহরে অনেক শিশুই এই বিশাল হোটেলগুলোর উচ্ছিষ্ট খায়।

'৭১ সালে শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন নিয়ে জন্ম নিয়েছিল এই দেশ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পুঁজিপতিশ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাষ্ট্রের টাকায় কলকারখানাগুলোকে দাঁড় করিয়ে, তারপর বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে একে তুলে দেওয়া হয় ব্যক্তিমালিকানায়। গোটা '৮০-র দশকে উদারনৈতিক অর্থনীতির জয়গান গেয়ে ও ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক লুটপাট করে গড়ে ওঠে একটি পুঁজিপতি-শিল্পপতি শ্রেণি। সময় গিয়েছে, ধনবৈষম্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যে-ই ক্ষমতায় এসেছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেদার লুটপাটের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী হয়েছে। তাদের সম্পদ বেড়ে আকাশ ছুঁয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বিগ হাউজদের জন্ম হয়েছে। তারাই আজ সবকিছুর নিয়ন্তা। ৫ বছর পরপর ক্ষমতায় আসা রাজনীতিবিদরা ম্যানেজার মাত্র। ভোটের আগে গরিব মানুষের কষ্ট নিয়ে দেশবরেণ্য নেতারা বক্তব্য রাখেন, অশ্রু বিসর্জন করেন। দেশের পার্লামেন্টের ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী। দেশ পরিচালিত হয় বিগ বিজনেস হাউজের ইশারায়।

এই গোষ্ঠীর কাছে মুনাফা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা নেই, মূল্যবোধ বলে কোনো শব্দ তাদের অভিধানে নেই। মুনাফার জন্য তারা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। দুই হাতে তারা জনগণের টাকা লুট করছে। এদের রাজত্বে নারী লাঞ্ছনা, শিশু নির্যাতন, প্রতিবাদীদের হত্যা নিত্যদিনের ঘটনা। ন্যায়নীতিসম্পন্ন, মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ এখানে অবাঞ্ছিত, অসহায়। পরপর কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনায় সারাদেশ যখন ঘৃণায়, ক্ষোভে, ব্যথায় মুহ্যমান তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য–ধর্ষণ সকল দেশেই ঘটে। এর আগে পয়লা বৈশাখে টিএসসিতে নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় পুলিশ কমিশনার মন্তব্য করেছিলেন, এগুলো কতগুলো দুষ্ট ছেলের কাজ। দেশের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা মন্তব্য করেন–নারীরা তেঁতুলের মতো, দেখলে জিভে জল আসে।

এই তো রাষ্ট্রনেতা, প্রশাসনের কর্তাদের চরিত্র, ধর্মীয় গুরুর মন্তব্য। সংসদে নারীদের নিয়ে স্থুল হাস্যরস হয়, সাংসদরা আমোদে মাতেন, একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপেন। তাহলে কোথায় নিরাপদ মেয়েরা? কোথায় মর্যাদা আছে? কোথাও নেই। কোনো জায়গাকে নিষ্কলুষ, সুন্দর, নির্মল রাখা যাবে না। রাখলে সেখান থেকেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে। তাই এই লুট, এই শোষণ জারি রাখতে হলে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে পিষে মারতে হবে। তারই আয়োজন চলছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, তারই ফলাফল এই ছাত্রলীগ, এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই পুলিশ প্রধান, এই ধর্মীয় নেতা।

এইভাবে ৪৯ বছর ধরে তারা দেশ পরিচালনা করছেন। এটাই তাদের শাসনপ্রক্রিয়া। তারা জানেন–মানুষকে পশুর স্তরে না নামালে তাকে দিয়ে পশুর কাজ করানো যাবে না। সেই পশু সৃষ্টির সমগ্র আয়োজন তাই তারা করেন। এর উপর দাঁড়িয়ে চলে লুট, সম্পদ বৃদ্ধি, ব্যবসা। তাই, সারাদেশে মাদকের বিস্তার, পর্নোগ্রাফির প্রসার। আমেরিকায় ৬০-৭০ দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বিরোধী আন্দোলন থেকে যুবসমাজকে সরাতে সিআইএ-র পরিকল্পনায় ড্রাগস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফিলিস্তিনিদের টিকে থাকার আন্দোলন দমাতে ইসরাইলী সরকারের একটি কৌশল হলো–ইসরাইলী যুবকদের টার্গেট করে অসংখ্য পর্নো টিভি চ্যানেলের অবিরত সম্প্রচার। যাতে তাদের লড়াকু ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মন নষ্ট হয়ে গিয়ে তারা পরিণত হয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগলিপ্সু ও বিকৃত রুচির পশুতে।

এদেশে কিশোর-তরুণদের জীবনের সুস্থ বিকাশের পথ বন্ধ করে রেখেছে পুঁজিবাদ। শিশুদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন নেই, সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা নেই। বড় মানুষদের জীবন তাদের কাছে তুলে ধরা হয় না। মিডিয়ায় অবিরাম চলছে ভোগবাদী জীবনের প্রচার। ছোটবেলা থেকে কানের কাছে জপা হয় – 'চাচা আপন পরান বাঁচা'। জীবনের উদ্দেশ্য তাদের শেখানো হয়–'খাও, দাও, ফূর্তি করো।' পড়াশোনার লক্ষ্য হলো ক্যারিয়ার গোছানো, চাকরি জোটানো যাতে বাড়ি-গাড়ি করা যায়। দেশে সেরকম নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব নেই যাকে অনুসরণ করে যুবকরা বড় হবে। তারা দেখছে–পরিবার, শিক্ষক, নেতা, বুদ্ধিজীবী সবাই নিজের নিজের আখের গোছানোর প্রতিযোগিতায় আছে। মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ লুপ্ত, সামাজিক কর্মকাণ্ডে কেউ উৎসাহ দেয় না।

অন্যদিকে হাতে হাতে মোবাইলে, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির অশ্লীল বিকৃত আনন্দের সুযোগ। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাদক, নেশার অন্ধকার জগতে ডুব দিলে সবকিছু ভুলে থাকা যায়, পাওয়া যায় কৃত্রিম আনন্দ। নারীজাতির প্রতি সম্মান কিশোর-তরুণদের কেউ শেখায় না, মেয়েদের শরীরসর্বস্ব ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখতেই তারা ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মেয়েরাও অনেকে এই ভোগবাদী সংস্কৃতির আক্রমণের বাইরে নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাদের ভাবতে শেখায়–শারীরিক সৌন্দর্য্যই তার প্রধান সম্পদ। রূপচর্চা, শাড়ি-গয়না ও বিয়েই যেন তার জীবনের লক্ষ্য। জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-মূল্যবোধে বড় হওয়ার কথা তাদের কেউ বলে না। ছোটবেলা থেকে ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক মেলা-মেশা, বন্ধুত্বের পরিবেশ আমাদের এই রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের অনেকাংশে নেই। এখানে বিরাট প্রভাব নিয়ে আছেন ওয়াজজীবী ধর্মীয় মাওলানারা, যারা নারীকে মনে করেন 'তেঁতুলে'র, মতো, যাদের দেখলেই 'জিভে জল আসে'। সুস্থ বিনোদনের অন্য সব রাস্তা বন্ধ থাকায় কিশোর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েদের আনন্দের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোপনে অকালপরিণত প্রেম ও যৌনতার চর্চা। স্বার্থপরতার এই সমাজে তা নিয়েও চলছে কাড়াকাড়ি, প্রতারণা, দখলের মানসিকতা। প্রেম ও যৌনতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু, মানুষকে ভালোবাসার মন ও দায়িত্ববোধ-মূল্যবোধ গড়ে না উঠলে কীভাবে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সুন্দর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সম্ভব? সংকীর্ণ মন নিয়ে প্রেমের নামে যা হবে তা হলো আত্মকেন্দ্রিক মোহ, সম্পত্তিজাত অধিকারবোধ। এজন্যই বেশিরভাগ প্রেম টেকে না, বিয়ে করলেও বেশিরভাগ সম্পর্ক আনন্দময় থাকে না।

এভাবে সুন্দর মন ও সুস্থ-সামাজিক জীবনের বিকাশের পথ রুদ্ধ। অন্যদিকে, পাড়ায় পাড়ায় আছে সরকারি দলের বড়ভাইয়েরা–দাপট নিয়ে চলতে চাইলে তাদের সাথে যোগ দাও। অস্ত্র, অর্থ, ক্ষমতা, হিরোইজম সব পাওয়া যাবে। সরকারি দলের সাথে থাকলে সাত খুন মাফ, পুলিশ-প্রশাসন-মুরুব্বিরা কেউ কিছু বলবে না। ক্ষমতার প্রতিয়োগিতায় লিপ্ত এসব 'রাজনৈতিক' নেতারা কিশোর-তরুণদের ব্যবহার করে বানান কিশোর গ্যাং, অপরাধী চক্র। তাদের ব্যবহার করেন নিজেদের প্রভাব বিস্তারে চাঁদাবাজি-মাস্তানিতে, বিনিময়ে দুর্নীতি-লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত নিজের সম্পদের ছিটেফোঁটা ভাগ তাদের দেন। এই পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রায় তুলেছে গত এক যুগ ধরে ক্ষমতাসীন (নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, ভোটডাকাতি করে) আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের ফ্যাসিবাদী শাসনে ও তাদের নেতা-কর্মীদের দাপটে সহজে কেউ মুখ খোলে না, প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বিবাহিতা মহিলাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের নৃশংস ঘটনায় গ্রামবাসী ও পরিবারের নীরবতা এর উদাহরণ। এই ক্ষমতার আশ্রয়ে দুর্নীতি-লুটপাট-দখলদারিত্ব-নিপীড়নের পাশাপাশি প্রতিদিন ঘটে চলেছে অসংখ্য নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-যৌন প্রতারণার ঘটনা। এর একাংশ মাত্র প্রকাশ্যে আসে, তাতেই আঁতকে ওঠে মানুষ। যেমন–সিলেট এমসি কলেজ হোস্টেলে স্বামীকে জিম্মি করে নববিবাহিতা ধর্ষণের ঘটনা। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে যখন জবরদস্তি ও অন্যায় চলতে থাকে, তখন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় দুর্বলতর জনগোষ্ঠী–নারী, শিশু, বৃদ্ধ, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধানের জন্য, নারীর সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এই শোষণমূলক সমাজকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। মানব ইতিহাসে এই ঘটনা ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এবং মানবসভ্যতা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল এর রূপ কেমন হতে পারে। নারীধর্ষণ, সামাজিক অপরাধের হার শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। দেহ বিক্রি করে যারা পেট চালাতো, সেই নারীদের পুনর্বাসন করা হয়েছেল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল নারীব্যবসায়ী চক্র। নারীরা শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, খেলাধুলায় এমনকি দেশরক্ষায় কতটা অগ্রসর ও পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল – তার উদাহরণ মহাকাশে প্রথম প্রেরিত মানুষ ছিলেন একজন সোভিয়েত নারী ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। চীনে হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক নিগড়ে নিষ্পেষিত নারীসমাজকে মুক্তি এনে দিয়েছিল বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ। কোন মানুষই পশু হয়ে জন্মায় না। এই বৈষম্যের সমাজ তাকে পশুতে রূপান্তরিত করে, তার টিকে থাকার স্বার্থেই করে। ফলে এই বেদনা, এই কষ্ট, এই ক্ষোভের জলোচ্ছাসকে সমাজ ভাঙার জন্য কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে হবে। নাহলে বারবার একই চিত্র আমাদের অশ্রুভেজা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে হবে।

করোনা মহামারীতে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের

একে অপরকে বিপদে সাহায্য করছে না, মেডিকেল সাহায্যের ক্ষেত্রেও হিসাব কষছে কে কাকে ঠকিয়ে কত লাভ করতে পারবে।

... এইরকম সব পুঁজিবাদী স্বার্থের সংঘাত চলছে। একদিকে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও তীব্র হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিও টলটলায়মান। অন্য দিকে আক্রান্ত হবে শ্রমিক শ্রেণি। আমেরিকা, ইউরোপে, আমাদের দেশে শ্রমিকদের বহু অধিকার যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা লড়াই করে আদায় করেছিল, তা এমনিতেই পুঁজিপতিরা ইতিমধ্যেই বহুলাংশে কেড়ে নিয়েছে। সামান্য ছিটেফোঁটা যা অবশিষ্ট ছিল, তাও সম্পূর্ণ কেড়ে নেবে। অল্প শ্রমিক দিয়ে কম মজুরিতে বেশি খাটানো চলবে, অটোমেশন, ডিজিটালাইজেশন ব্যাপকভাবে চালু হবে, অর্থাৎ লেবার ইনটেনসিভের পরিবর্তে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ উৎপাদন পদ্ধতি চালু হবে ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদের মুনাফার স্বার্থে। কাজের সময়ের কোনও সীমা থাকবে না। নির্দিষ্ট মজুরি বলেও কিছু থাকবে না। যখন তখন ছাঁটাই করে দিতে পারবে, যখন তখন কলকারখানা বন্ধ করে দিতে পারবে।

আরেকটা প্রশ্নেরও সৃষ্টি হচ্ছে, তা হল, এই সঙ্কটের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়। এই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে নিয়ে এখন অনেক লেখালেখি চলছে। পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য যেসব অর্থনীতিবিদরা রয়েছে তারা নানা টোটকা বাতলাচ্ছে। একদল কেইনসের থিওরির কথা বলছে। ১৯৩০ সালে মহামন্দার সময়ে যখন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে, বাজার খুবই সঙ্কুচিত, ফলে কারখানার পর কারখানায় লালবাতি জ্বলছে, লোকের কাজ নেই, একমাত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছাড়া সব দেশেই এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কেইনস সাহেব বুর্জোয়া দেশগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল, বাড়তি নোট ছাপাও, ছাপিয়ে পাবলিককে দিয়ে দাও, তা হলে পাবলিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এটা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো, এর ফলে উল্টো দিকে সমস্যা হয়। নোট ছাপানোর একটা নীতি থাকে। উৎপাদন যদি ১০০ হয়, সেই পরিমাণ নোট ছাপা হবে। উৎপাদন ১০০, আমি নোট ছাপলাম ১০০০, তা হলে মুদ্রার দাম কমে যায়। এতে ইনফ্লেশন অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, টাকার দাম ভীষণভাবে কমে যায়, জিনিসপত্রের দাম ব্যাপক বেড়ে যায়। তিনি আরও বলেছিলেন কাজ নেই, কাজ সৃষ্টি কর। কিছু লোককে দিয়ে মাটি কেটে গর্ত সৃষ্টি কর, আবার কিছু লোককে দিয়ে সেই গর্ত ভর্তি করাও। এই সাজেশন এখন আবার কেউ কেউ দিচ্ছে মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে বাঁচাবার জন্য। আরেক দল বলছে, মালিকরা যা লাভ করবে তার একটা অংশ রাষ্ট্র নিয়ে শ্রমিকদের দিক। এটা হচ্ছে শেয়ারিং অফ প্রফিট। এইসব নানা থিওরি আজ আসছে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য।

... আমরা এখন দেখছি মুহূর্তে মুহূর্তে সঙ্কট, শেয়ার মার্কেট টলমল করছে। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের প্রবল বাজার সঙ্কট চলছে। আর দেখছি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন নিজেদের ন্যাশনাল ইকনমির স্বার্থের থেকেও মুনফা লুণ্ঠনের স্বার্থকেই বড় করে দেখছে। তাই বিদেশে আউটসোর্সিং করাচ্ছে সস্তায় মজুর ও কাঁচামাল ব্যবহার করে। সেই পণ্যই নিজ দেশে ও অন্যত্র বেশি দামে বিক্রি করছে। নিজ দেশের পুঁজি ও ইন্ডাস্ট্রি অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরাও বিদেশে পুঁজি ইনভেস্ট করছে, কারখানা-খনি কিনছে। এদের জাতীয় স্বার্থ বলতে ততটুকু, নিজেদের লুণ্ঠনের স্বার্থে যতটুকু জাতীয় রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা যায়। তাই এদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। যার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখছেন দেশে প্রবলভাবে বেকারি বাড়ছে। ফলে এদের ওপর চাপ দিচ্ছে বিদেশে আউটসোর্সিং বন্ধ করার জন্য, নিজ দেশে পুঁজি ইনভেস্ট করার জন্য। হুমকি দিচ্ছেন, না করলে রাষ্ট্র সব সুবিধা বন্ধ করে দেবে। এটা করা হচ্ছে মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচাবার স্বার্থেই। কারণ যে-কোনও মুহূর্তে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট' আবার মাথা তুলতে পারে, দেশে এমনই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। যার জন্য নিজে গ্লোবালাইজেশনের হোতা হয়েও আজ তার নিজের দেশের অর্থনীতি সঙ্কটগ্রস্ত হওয়ায় নিজেই গ্লোবালাইজেশনের বিরোধিতা করছে। ঘোষণা করেছে 'আমেরিকান ইন্টারেস্ট ফার্স্ট'।

এই অবস্থায় পরবর্তী সময়ে ১৯৩০ সালের চেয়েও ভয়ঙ্কর মন্দা আসছে। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড ডিরেক্টর ইতিমধ্যেই ওয়ার্নিং দিয়েছেন 'ক্ষুধার মহামারি' আসছে। তাঁর হিসাবে ইতিমধ্যেই বিশ্বে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। এই সংখ্যা আরও বহুগুণ বাড়বে। কোটি কোটি বেকার, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল গোটা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশেও ঘটবে। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, বিশ্বে কোনও শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি নেই যে আজকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংঘটিত করতে পারে। ভারতবর্ষেও আমরা এককভাবে তা সংঘটিত করার মতো অবস্থায় নেই। এরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন আমরা।

... আগামী দিনে যে প্রয়োজন আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে ভারতবর্ষের বুকে এবং বিশ্বে সেই প্রয়োজনে যাতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা যথার্থ ভূমিকা নিতে পারি সেই সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। প্রথমত, যেখানে লকডাউন শিথিল হচ্ছে সেইসব জায়গার কর্মীরা মেডিকেল সিকিউরিটি বজায় রেখে যথাসম্ভব রিলিফের কাজে আরও আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু কমরেডদের মনে রাখতে হবে কে করোনা ভাইরাস ক্যারি করছে, কে করছে না তা বোঝার উপায় নেই। ফলে সব সতর্কতা মেনেই সেইসব জায়গায় রিলিফের কাজে তাঁরা নামবেন। আর যখন পুরোপুরি লকডাউন তুলে নেওয়া হবে তখন আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব রিলিফ সংগ্রহ করা এবং বণ্টনের কাজে। এটা করতে হবে দলের নামে, গণসংগঠনের নামে, বিভিন্ন ফোরামের নামে। ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি, তাঁদেরও আমরা রিলিফ সংগ্রহ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে সামিল করব। তাতে যদি পাবলিক কমিটি করতে হয় পাবলিক কমিটিই করব। অন্য দলের লোককেও যদি এই কাজে পাই তাঁদেরও সামিল করব। আমাদের দলের সকল স্তরের সদস্য ছাড়াও গণসংগঠনগুলির সাধারণ সদস্য, দলের সমর্থক, কর্মীদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, একসময়ে কাজে ছিল এখন পারে না, আগ্রহী সাধারণ পাবলিককে সকলকেই আমরা এই কাজে যুক্ত করব। দেশে বিদেশে যে ধরনেরই হোক, যেমন যোগাযোগ আছে, এই রিলিফ সংগ্রহ করা এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাব।

এটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আমাদের করতে হবে। যেখানে ঝান্ডা নিয়ে কাজ করা যায় করব। যেখানে তা করা যাবে না, ঝান্ডা ছাড়াই আমরা কাজ করব। যেখানে প্রয়োজন, পাবলিক কমিটি করেই করব। আমি জানি, আমাদের দলের কর্মীদের মানবিক মূল্যবোধ উন্নত স্তরের। তারা অবশ্যই এই কাজে উদ্যোগী হবেন। অন্য দিকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে হবে যাতে ব্যাপকভাবে রিলিফ দেয়। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে আমাদের দল, দলের বিভিন্ন শ্রেণিসংগঠন ও গণসংগঠনগুলি এবং ফোরামগুলিকে প্রস্তুত থাকতে হবে জনগণের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের জন্য। খাদ্যের দাবিতে ক্ষুধার্ত মানুষ, চাকরির দাবিতে কর্মচ্যুত শ্রমিক ও বেকার যুবক, চরম সঙ্কটগ্রস্ত ক্ষেতমজুর, গরিব ও মাঝারি কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিভিন্ন স্তরের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ নানা স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠবে। পাবলিক কমিটি গঠন করে এগুলিকে সুসংহত, সংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল আন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে যখনই সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেখানেই কমরেডরা উদ্যোগ নেবে, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবে না। এই আন্দোলনে অন্য দলের লোকজনও যদি আসে আমরা আপত্তি করব না। অন্য দলও যদি কোথাও জনগণের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে, আমরা তাতেও থাকব, না ডাকলেও যাব। এটা একটা এমার্জেন্সি পিরিয়ড। আন্দোলনটা চাই, যারা যতদূর আন্দোলনে যেতে প্রস্তুত তাদের নিয়ে আমরা আন্দোলন করব। কিন্তু উদ্যোগটা আমাদের নিতে হবে। এটা আমাদের বুঝতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, মহিলা নানা বৃত্তির সংগঠন প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকতে হবে জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা যাতে আন্দোলনে নামতে পারি এবং জনগণের উপর যে আক্রমণ হবে সে আক্রমণ যাতে মোকাবিলা করতে পারি, তার জন্য। এখানে আরও একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে, গণতন্ত্রের যতটুকু ধ্বংসাবশেষ আজও বুর্জোয়া শাসকবর্গ মৌখিকভাবে হলেও বজায় রেখেছে, আগামী দিনে সেই গণতন্ত্রেরও লেশমাত্র থাকবে না। আরও নগ্ন ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ঘটতে থাকবে এবং গণবিক্ষোভ দমনে সরকার আরও নিষ্ঠুর ভূমিকা নেবে, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আরও দানবীয় আইন আসতে থাকবে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্বে উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, সম্প্রদায়গত বিরোধ, আমাদের দেশে প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় হানাহানি, জাত-পাতের লড়াই, আদিবাসী-অ-আদিবাসী বিরোধ ইত্যাদি যা যা আছে বুর্জোয়ারা এগুলোকে প্রবলভাবে উস্কানি দেবে জনগণের ঐক্যকে ভাঙবার জন্য। এগুলির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

... একটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছি, বিশ্বের এই পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের এই পরিস্থিতি দেখে। এই অবস্থায় আমরা বিপ্লবীরা কিছু করতে পারছি না। ফলে দলের শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে যাতে এ দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আরও তীব্র লড়াই করতে পারি এবং তার দ্বারা বিশ্ব বিপ্লবকে সাহায্য করতে পারি– এখানকার কমরেডরা, বাইরে যে কমরেডরা আছেন, এই পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। ..."

করোনায় বিপর্যস্ত জনগণের জীবন-জীবিকা

মানুষের আগ্রহ কম। হাসপাতালে গেলে যথাযথ সেবা পাওয়া যাবে না ও জীবন ঝুঁকিতে পড়বে, এমন আশঙ্কায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা হাসপাতালে যেতে চাইছেন না। কোভিড চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোর শয্যা ফাঁকা পড়ে আছে, কিন্তু প্রতিদিন করোনায় মানুষ মরছে। হাটবাজার, রাস্তাঘাটসহ জনাকীর্ণ স্থানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি, মাস্ক পরা ও শারীরিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। এখনো পর্যন্ত আমেরিকা-ইউরোপের তুলনায় দেশে মৃত্যুহার কম হলেও, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনা ভাইরাস যেকোনো সময় রূপ পরিবর্তন করে আরও বেশি জীবনঘাতী হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে। শীতকালে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসতে পারে এবং তার জন্য প্রস্তুতি দরকার–প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু প্রস্তুতির তৎপরতা কিছু চোখে পড়ছে না। অনেকে বলছেন–করোনার প্রথম ঢেউ-ই এখনো শেষ হয়নি, দ্বিতীয় ঢেউ তো পরের কথা। দেশে কতদিনে এই রোগ কমবে–কেউ বলতে পারছে না। বর্তমানে সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি কোনো ব্যবস্থা প্রায় নেওয়া হচ্ছে না। অথচ, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আপনা-আপনি কমবে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে–সরকার জনগণকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা মরার মরবে ও যারা বাঁচার বাঁচবে।

করোনায় অর্থনৈতিক দুর্দশা : সরকারের দায়িত্ব কী?

অন্যদিকে করোনাজনিত অর্থনৈতিক মন্দার অজুহাতে ছাঁটাই-বেতন কর্তন চলছে, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বাড়ছে। প্রবাসীরা অনেকে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। করোনায় কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে আওয়ামী লীগ সরকার ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ করে দিয়ে ৬০ হাজার শ্রমিককে এক ধাক্কায় বেকার করে দিয়েছে, পাটচাষিদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অর্থনৈতিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষ-কৃষক-নিম্নবিত্তকে সহায়তা দেওয়ার পরিবর্তে সরকার প্রধানত শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাকালে আর্থিক দুর্দশায় পড়া নাগরিকদের বাড়িভাড়া-ইউটিলিটি বিল সরকার প্রদান করছে। অথচ, বাংলাদেশে ভুতুড়ে বিদ্যুৎবিলের বোঝা চাপানো হচ্ছে, পানির বিল-গাড়িভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। মজুতদার-কালোবাজারি-মুনাফালোভীদের সিণ্ডিকেট ব্যবসা ও সরকারি হস্তক্ষেপের অভাবে লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ আরও বেড়েছে। এরকম অবস্থায় মানুষ অসহায় ও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন পার করছে।

দুর্নীতি-লুটপাটই এই সরকারের 'নীতি'

দেশের এই অতিমারির সময়েও যে বেপরোয়া দুর্নীতি-প্রতারণা ও জালিয়াতি হতে পারে, সেই নজির স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশে। চিকিৎসাকর্মীদের জন্য মাস্ক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী(পিপিই) কেনায় দুর্নীতি, কোভিড পরীক্ষার নামে জালিয়াতি, অনুমোদন বা লাইসেন্স ছাড়া হাসপাতাল পরিচালনা, যোগ্যতা না থাকলেও বিভিন্ন হাসপাতালকে কোভিড পরীক্ষা ও চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলায় কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজি কেলেংকারির পর বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে পূর্বানুমতির বিধান করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালে গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ করা চাল ও অর্থ আত্মসাতের অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সরকার আইওয়াশের জন্য ছোটখাট দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে একদিকে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্যদিকে, এসব নিয়ে লেখালেখির কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত করোনার মধ্যেই ৮৭ জন সংবাদিক ও অনলাইন লেখককে 'গুজব' ছড়ানোর অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হাজার হাজার টাকায় বালিশ-পর্দা কেনা, স্কুলে খিচুড়ি বিতরণ ও গণগ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণে অভিজ্ঞতা অর্জনের নামে বিদেশ ভ্রমণ, সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করেই বিল উত্তোলন–সংবাদপত্রে প্রকাশিত এধরনের অসংখ্য দুর্নীতির ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে কীভাবে হরিলুট চলছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানিয়েছে–মেডিকেল যন্ত্রপাতির দাম বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দেখানো ছাড়াও হাসপাতালের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ে সরকারের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা গত পাঁচ বছরে হাতিয়ে নিয়েছে স্বাস্থ্যখাতের কয়েকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাংকের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার অর্থায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক 'গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি' প্রকল্পের ডিপিপি-তে গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। বেসরকারি খাতে সামিট-ইউনাইটেডসহ ৯টি বড় গ্রুপ এবং কোম্পানির বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জন্য পিডিবি গত এক দশকে ১৯ হাজার ২০৯ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াই কেন্দ্রভাড়া বাবদ এ অর্থ দিয়েছে। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তিন বছর আগে এক হাজার মেগাওয়াটের ছয়টি ডিজেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেয় সরকার। এদের বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হচ্ছে, যাতে ৬-৭ টাকার প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় পড়ছে ৩০০-১৫০০ টাকার বেশি। সম্প্রতি পুলিশের এজাহারে জানা গেছে–ফরিদপুরের ২ জন যুবলীগ ও ১ জন ছাত্রলীগ নেতা মিলে বিদেশে পাচার করেছেন ২০০০ কোটি টাকার বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন ড্রাইভারের শত শত কোটি টাকা সম্পদের তথ্য এসেছে। যুবলীগ নেতা ঠিকাদার জি কে শামীমকে গ্রেপ্তারের সময়ে শুধু তার অফিস থেকে পাওয়া গেছে ২০০ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক একাউন্টের কাগজপত্র। আরেক যুবলীগ নেতা 'সম্রাট' নিয়মিত সিঙ্গাপুরে ক্যাসিনোতে জুয়া খেলেন লাখ লাখ ডলার। সংবাদপত্রে এধরনের অসংখ্য খবর আসে। এসব দেখে কে বলবে–বাংলাদেশ গরিব দেশ!

সরকারি নিপীড়ন বাড়ছে

মানুষের জীবন বাঁচানোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া ও প্রয়োজনে জনগণের খাদ্য-জীবিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়ার জন্য যে দায়বদ্ধ মনোভাব ও জনসম্পৃক্ত ব্যবস্থাপনা দরকার, তার কিছুই এ স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের চরিত্রে নেই। রাতের আঁধারে ভোটডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। বরং তারা গণবিক্ষোভ ঠেকাতে ও সমালোচনাকারীদের দমনে নিপীড়ন চালাচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গত ২ বছরে হাজারের বেশি মামলা হয়েছে, দেড় হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সম্প্রতি কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে মেজর সিন্‌হার মৃত্যু, তাকে মাদকব্যবসায়ী সাজানোর চেষ্টা, মাদক দমনের নামে শুধুমাত্র ওই জেলায় 'ক্রসফায়ারে' দুই শতাধিক মানুষ হত্যা এসব ঘটনায় উঠে এসেছে–এদেশে সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে মানুষের জীবন কতটা নিরাপত্তাহীন। বেআইনী আটক, গুম, হয়রানিমূলক মামলা, পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন, মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়, সভা-সমাবেশে বাধাদান–এসব চলছেই।

সরকারদলীয়দের ধর্ষণ 'উৎসব'!

করোনার পাশাপাশি দেশ যেন নারী নির্যাতন-ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সিলেট শহরের ওপর এমসি কলেজ হোস্টেলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছে। এরপরই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে একজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে কুৎসিত অত্যাচার করলো স্থানীয় যুবলীগের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসীরা। প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত অসংখ্য নারী-শিশু ধর্ষণের সংবাদের মধ্যে এঘটনাটি দেশের নারীসমাজসহ জনগণকে চরম আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। যত খবর প্রকাশ্যে আসে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ধর্ষণের ঘটনা আড়ালে থেকে যায় লোকলজ্জা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে। দেখা যাচ্ছে–বেশিরভাগ ধর্ষকরা ক্ষমতাসীনদের সাথে যুক্ত অথবা তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে লালিত। ধর্ষণের ঘটনা ফাঁস হলে মীমাংসার নামে ধামাচাপা দেওয়া ও অপরাধীকে বাঁচাতে মূল ভূমিকা পালন করে শাসকদলের স্থানীয় নেতা ও সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা। ধর্ষণের মানসিকতা গড়ে তোলে যে পর্নোগ্রাফি, মাদক, গুণ্ডাতন্ত্র ও ভোগবাদী অপসংস্কৃতির বিস্তার–তারও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ক্ষমতার সাথে যুক্ত প্রভাবশালীরা। 'ইয়াবা' বদি নামে খ্যাত কক্সবাজারের আওয়ামী এমপির দাপট, মহিলা লীগনেত্রী পাপিয়ার দেহব্যবসা চক্র, যুবলীগ নেতাদের ক্যাসিনো ব্যবসা, শাসক দলের এমপি-র আদম পাচার, বরগুনাসহ সারাদেশে সরকারি দলের নেতাদের আশ্রয়ে কিশোর গ্যাং-এর হাতে খুন-জখম, ছাত্রলীগ নেতা কর্তৃক গৃহকর্মী ধর্ষণ, নারী ও কিশোরদের বাধ্য করে বা ব্ল্যাকমেইল করে পর্নোচিত্র ধারণ–এধরনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যায়। মাঝে-মধ্যে জনমতের চাপে বা শাসকদলের অভ্যন্তরীণ 'শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য কিছু অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইওয়াশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীরা পার পায়, উপযুক্ত বিচার হয় না–ক্ষমতাসীনদের সাথে তাদের যোগাযোগের কারণে। এই মাফিয়া শাসন ও অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া ধর্ষণের মহামারি রোধ করা যাবে না, নারীর মর্যাদা-নিরাপত্তা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা যাবে না।

'উন্নয়নের জোয়ার'-এর আসল চেহারা

করোনা মহামারিতে আমাদের দেশে ও বিশ্বে লাখ লাখ মানুষের অসহায় মৃত্যু, সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশা সবাইকে নতুন করে ভাবাচ্ছে। মানবসভ্যতার এত অগ্রগতি ও মানবজাতির সম্পদবৃদ্ধিতে কারা লাভবান হচ্ছে – ধনীরা না সাধারণ মানুষ? সে প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে। করোনাকালে আওয়ামী লীগ সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের আসল চেহারা পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো প্রধান শহরেই বেশিরভাগ হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই-এর মতো প্রাথমিক জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা নেই, আইসিইউ-এর জন্য হাহাকার তৈরি হয়েছে। জেলা-উপজেলা হাসপাতালগুলোর কথা বলাই বাহুল্য। সরকারি হাসপাতালগুলোর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এই একটি তথ্যেই বোঝা যায়। অথচ দেশের বেশিরভাগ গরিব মানুষের চিকিৎসার একমাত্র জায়গা এই সরকারি হাসপাতালগুলোই। অবহেলিত সরকারি হাসপাতালগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা তাদের চিকিৎসা করাতেন বেসরকারি ব্যয়বহুল হাসপাতালে, অনেকে যেতেন ভারতসহ বিদেশে। করোনায় দেখা গেল বেসরকারি হাসপাতালগুলো বেশিরভাগ বন্ধ, চালুগুলোতে চিকিৎসার পর্যাপ্ত আয়োজন ও দক্ষ-নিবেদিত ডাক্তারসহ জনবল নেই। বিদেশে যেতে না পারায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরও চিকিৎসায় বিপন্ন দশার মুখোমুখি হতে হয়েছে। অন্যদিকে, দুয়েক মাস লকডাউনেই দেশের বেশিরভাগ পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে, অর্থাৎ কাজ বন্ধ থাকলে অল্প কিছুদিন চলবার মতো সঞ্চয় নেই বেশিরভাগ মানুষের। ব্র্যাকের পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে–করোনা পরিস্থিতিতে চরম দারিদ্র্য আগের তুলনায় ৬০% বেড়েছে। বিআইডিএস-এর জরিপ বলছে–করোনার কারণে দেশের ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ নতুন করে গরিব হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রচার করত–বাংলাদেশ নাকি বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হয়ে গেছে। করোনাকালে জনজীবনের দুর্দশায় 'উন্নতি'র আড়ালে ধনী-গরীব বৈষম্য নগ্নভাবে প্রকাশিত হলো।

করোনা মহামারি কী শিক্ষা দিল

এই অবস্থা কেন হলো? আসলে দরিদ্র বাংলাদেশসহ তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি–পুঁজিবাদী সরকারগুলো সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব নেওয়ার চাইতে মালিকগোষ্ঠী-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মুনাফা ঠিক রাখতে বেশি তৎপর। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকলরকম সেবাখাতকে বেসরকারিকরণ করে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। চিকিৎসা সে-ই পাবে, যার টাকা আছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অবহেলা করে জোর দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসাসেবা ক্রয়ের ওপর। ফলে, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর মিছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। উন্নত দেশগুলোতেও করোনার শিকার প্রধানত সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, দরিদ্র, কালো ও অভিবাসীরা। কারণ, জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণে তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল এবং তারা অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশে থাকে। তাদের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়। আবার, তারা অর্থনীতির চাকা সচল না রাখলে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের লাভও হবে না। তাদের মুনাফা অব্যাহত রাখতেই ট্রাম্প-বলসারেনোসহ বুর্জোয়া শাসকরা লকডাউনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও করোনার বিপদকে লঘু করে দেখাতে চায়। ফলে পুঁজিবাদসৃষ্ট শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য এ রোগ বিস্তারে প্রধান ভূমিকা রাখছে। যেখান থেকে নিস্তার পাচ্ছে না সুবিধাভোগী ও ধনীরাও।

অন্যদিকে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। মানববিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণে, সামরিক খাতে, গোয়েন্দা নজরদারিতে শাসকরা শ্রম–অর্থ-মেধা বিনিয়োগ করেছে। মানুষ বাঁচাতে রোগ প্রতিরোধ-নিরাময় গবেষণায় তার ছিটেফোঁটাও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানের চর্চা ও মৌলিক গবেষণা এভাবে অবহেলিত না হলে হয়তো অতিদ্রুত এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার হতে পারত। এখনো, ভ্যাকসিন ও ওষুধ আবিষ্কারে মানবজাতির সকল মেধা-জ্ঞান ও সম্পদকে সম্মিলিত করে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না। ভ্যাকসিনসহ চিকিৎসাবাণিজ্য ও বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে চলছে প্রতিযোগিতা।

পাশাপাশি, পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নেশায় প্রকৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে। বনভূমি কমে যাওয়ায় বন্যপ্রাণী লোকালয় ও মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছে। মানুষ ও প্রাণীর দূরত্ব কমে যাওয়ায় তাদের শরীর থেকে অজানা সব ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে। সকলেই জানেন, এবারের নতুন করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি চীনের উহান শহরের একটি বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে। ধারণা করা হচ্ছে–বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিন এই ভাইরাসের মূল বাহক।

করোনা মহামারি শিক্ষা দিল–আমরা কেউ একা বাঁচতে পারব না, সামাজিক সংহতি ও সম্মিলিত প্রতিরোধ জরুরি। সবার স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা না গেলে কেউ নিরাপদ নয়। গণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা, মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা ও সাম্য ছাড়া মহামারি প্রতিরোধ সম্ভব নয়। ধনীদের মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনীতি নয়, চাই সব মানুষের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সমাজব্যবস্থা। তার জন্য চাই শোষকদের উচ্ছেদ করে শোষিতদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। যে সমাজে স্বাস্থ্য-চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্র নেবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে সকলের জীবিকা নিশ্চিত করা। যতক্ষণ তা প্রতিষ্ঠা করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার যতটুকু সম্ভব, আদায়ে চাই লাগাতার গণআন্দোলন।

বিশ্বমন্দার কালো ছায়া : গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত হবে

আগেই বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকট চলছিল, এখন করোনার প্রভাবে ভয়ঙ্কর মন্দার আশংকা দেখা দিচ্ছে। অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, বেতন হ্রাস ঘটছে। পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে অল্প শ্রমিক দিয়ে কম মজুরিতে বেশি খাটানো, অটোমেশন, ডিজিটালাইজেশন, ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ উৎপাদন পদ্ধতি চালু হবে ব্যাপকভাবে। কাজের সময়ের কোনো সীমা থাকবে না। নির্দিষ্ট মজুরি বলেও কিছু থাকবে না। যখন তখন ছাঁটাই করে দিতে পারবে, যখন তখন কলকারখানা বন্ধ করে দিতে পারবে। আরেকটা দিক হচ্ছে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় শক্তি ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটবে। স্বার্থের সংঘাত আরও তীব্র হবে, যা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এমনকি সীমিত-স্থানীয় যুদ্ধেরও রূপ নিতে পারে। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে–'ক্ষুধার মহামারি' আসছে। তাঁর হিসাবে ইতিমধ্যেই বিশ্বে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। এই সংখ্যা আরও বহুগুণ বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বাড়বে।

এর বিপরীতে বিভিন্ন স্তরের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ নানা স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। খাদ্যের দাবিতে ক্ষুধার্ত মানুষ, চাকরির দাবিতে কর্মচ্যুত শ্রমিক ও বেকার যুবক, চরম সঙ্কটগ্রস্ত খেতমজুর, গরিব ও মাঝারি কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী–এদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠবে। একে ঠেকাতে বুর্জোয়া শাসন আগামী দিনে আরও কর্তৃত্ববাদী-ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠবে। জনগণের ওপর গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি আরও তীব্র হবে, গণবিক্ষোভ দমনে সরকার আরও নিষ্ঠুর ভূমিকা নেবে। জনগণের ঐক্যকে ভাঙার জন্য বুর্জোয়া শাসকরা উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় হানাহানি, জাতিগত বিদ্বেষ ইত্যাদিকে উসকে দেবে।

আন্দোলনই বাঁচার একমাত্র পথ

এই পরিস্থিতিতে–জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ মোকাবিলা করতে বামপন্থী দলগুলোকেই সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে। ক্ষুদ্র ও দুর্বল হলেও এদেশে তারাই একমাত্র জনগণের পক্ষের শক্তি। অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের এক দশক জুড়ে স্বৈরতান্ত্রিক, গণবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ। অবিলম্বে এর অবসান চাই। কিন্তু, বিকল্প কী? আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত–ক্ষমতা নিয়ে এদের যত বিরোধই থাকুক, অর্থনৈতিক নীতিতে তারা এক। আওয়ামী লীগ যেমন ২৫টি পটিকল বন্ধ করেছে, বিএনপিও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করেছিল।

'ক্রসফায়ার-এনকাউন্টার' নাম দিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আওয়ামী লীগ, বিএনপিও তেমনি অপারেশন ক্লিনহার্টে 'হার্ট এটাক' নাটক সাজিয়েছিল। কালো পোশাকের র‍্যাব তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিএনপি দুর্নীতির 'হাওয়া ভবন' বানিয়েছিল, আওয়ামী লীগ সকল ভবনে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। জামাতের সঙ্গে বিএনপি-র আপত্তি নেই, আওয়ামী লীগেরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হেফাজতে ইসলাম ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের হাত ধরতে অসুবিধা নেই। ফলে–বিকল্প রাজনীতি চাই, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির উত্থান চাই।

এখন কথা হলো–আওয়ামী লীগ-বিএনপি 'খারাপ' বলেই কি বামপন্থীরা 'ভালো' হয়ে গেল? এর জন্য বামপন্থীদেরও সত্যিকার 'বামপন্থী' হয়ে উঠতে হবে, যারা হবে জনঘনিষ্ঠ ও সংগ্রামী। বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির বিপরীতে জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলনের শক্তি গড়ে তোলা ও মানুষের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। আবার, বামপন্থীদের মধ্যে থেকেও সঠিক বিপ্লবী শক্তি গড়ে উঠতে হবে–যারা গণআন্দোলনের পথে জনগণকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করবে এবং জ্ঞানে-চরিত্রে-সংগ্রামে মানুষকে পথ দেখাবে। মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলনের কষ্টকর পথে তাদের আস্থা অর্জন না করে, যে কারো সাথে হাত মিলিয়ে বুর্জোয়াদের শক্তিশালী করে রাতারাতি বড় শক্তি হওয়ার রাস্তায় হাঁটলে তা আত্মঘাতী হবে। সঠিক পথে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির ওপরই দেশের শোষিত মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

ভারত-চীনের দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশে

হোক–বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দরকষাকষি করে যা কিছু আদায় হয়, তা-ও পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করছে। ফলে এর দ্বারা বাংলাদেশ লাভবান হচ্ছে–এটা বলা যায় না। কারণ দেশ মানে, পুঁজিপতিশ্রেণি নয়–দেশের জনগণ।

দ্বিতীয়ত, বলা হয় বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে সরকার ভারত ও চীনকে দেদারসে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। এতে বিনিয়োগ কিছু বাড়ছে এটাও সত্য। কিন্তু সে বিনিয়োগের দ্বারা আমরা কি লাভবান হচ্ছি? বিনিয়োগ মানে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজের দেশের পুঁজি অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেই দেশের কাঁচামাল, সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে মুনাফা লুণ্ঠন করতে। তাই বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগে এদেশের অর্থনীতিতে সাময়িক গতি সঞ্চার হলেও এটা বুঝতে হবে, বিভিন্ন কায়দায় তারা মুনাফা তুলে নিচ্ছে। তাতে দেশের লাভ যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি চলে যাচ্ছে। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ মানে তাদের দেশের নির্মাণসামগ্রীর বাজার বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ। এভাবে যে টাকা বিনিয়োগ করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি তুলে নিয়ে যায়। ফলে বিনিয়োগের দ্বারা দেশের পুঁজিপতিরা কিছু লাভবান হলেও প্রকৃতপক্ষে জনগণের কোনো লাভ হয় না। বরং জনগণের ওপর চেপে বসে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশের টাকায় বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ করে বাজার সংকটে ভুগতে থাকা দেশের পুঁজিপতিদের কিছুটা সাময়িক রিলিফ দিতে পারলেও অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি তৈরি হয় না। বরং ঋণের সুদ উসুল করার জন্য জনগণের কাঁধে চাপে ট্যাক্সের বোঝা। আর ঋণ সহায়তা ও বিনিয়োগের নামে দেশের অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত ও চীনও ক্রমান্বয়ে ঋণ ও বিনিয়োগের নামে সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথেই হাঁটছে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক বৃহত্তর অর্থনীতির দেশ হওয়ায় চীন তাতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে মাত্র।

চীন বা ভারত যে দেশই হোক উভয়েই নিজ স্বার্থেই এদেশে আসছে। বাংলাদেশের শাসকশ্রেণিও তাদের সাথে সমঝোতা করে চলছে নিজেদের স্বার্থেই। কিন্তু দুই দেশের সাথে শাসকশ্রেণির মৈত্রী বা বৈরিতা যাই হোক, সবই এদেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থেই হচ্ছে। এতে দেশের জনগণের কোনো লাভ নেই। বরং চীন-ভারতের সাথে বাংলাদেশের শাসকদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া মানে এদেশের জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি। তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্তি চাইলে প্রয়োজন এদেশের বুক থেকে পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী শাসক তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রাম তীব্র করা।

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২০

ভারত-চীনের দ্বন্দ্ব ও বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব প্রসঙ্গে

গোটা বিশ্ব করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত। করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ এবং সংক্রমণ মোকাবেলার তৎপরতাকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব ও নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই ভাইরাস মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। এক দেশের সাথে আরেক দেশের স্থল-নৌ-আকাশ পথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাথেও প্রতিবেশী দেশসমূহের যোগাযোগ বন্ধ। অথচ এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত ১৮ ও ১৯ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দুই দিনের ঝটিকা সফরে বাংলাদেশে আসেন। তার এই সফরকে কেন্দ্র করে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে চীনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা আবারও তুঙ্গে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি এবং চীনের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে নানান মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির মধ্যেই লাদাখে চীন-ভারতের সংঘর্ষের পর থেকে বাংলাদেশকে নিয়ে চীন-ভারতের টানাটানি বেড়েছে এবং দৃশ্যমান হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলেও তা মনোযোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশকে নিয়ে চীন-ভারতের টানাটানির প্রধান কারণ বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা। বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে হওয়ায় ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

তাই এই অঞ্চলের রাজনীতিগত তাৎপর্য বুঝতে হলে বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বোঝাটাও জরুরি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য ছিল। অর্থাৎ বিশ্ব রাজনীতি এক মেরুকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সংকট ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতা থেকে গত এক দশকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। স্পষ্টতই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে কয়েকটি ভাগ। আমেরিকার একক আধিপত্য এই সময়ে দুর্বল হয়েছে। পাশাপাশি চীনের অর্থনৈতিক উত্থান ঘটেছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে আমেরিকার প্রধান বিরোধের জায়গাও এখন চীন। চীনকে মোকাবেলায় এই অঞ্চলে আমেরিকা ভারতের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেছে শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে চীনকে শুধু আমেরিকা নয়, একই সাথে ভারতকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

চীন তার সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ চরিতার্থ করতে পুরনো সিল্ক রোডের পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশে দেশে বিনিয়োগ ও সামরিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশ এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছে। এই প্রকল্পকে সফল করতে চীন গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান চীনের। শুধু বিনিয়োগই নয়, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেলসহ অনেকগুলো মেগা প্রকল্পে চীন যুক্ত হয়েছে। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় ২৬টি সমঝোতা স্মারক চুক্তি করে দুই দেশ। এবং ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় চীন। বাংলাদেশের আমদানির প্রধান উৎসও এখন চীন। প্রতিবছর ১৬-১৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি হয় চীন থেকে। প্রযুক্তি পণ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের জন্যও বাংলাদেশ চীনের উপর নির্ভরশীল। যদিও বিপরীত দিকে বাংলাদেশ চীনে মাত্র ৭৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে পারে। আবার সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহেরও প্রধান উৎস চীন। বিগত বছর কয়েক আগেই বাংলাদেশ চীনের নিকট থেকে দুটি সাবমেরিন ক্রয় করেছে। ফলে বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ ও সামরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে চীন বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই গভীরতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশের সাথে চীনের এই সংযোগের গভীরতা যত বাড়ছে, ভারতের উদ্বিগ্নতাও তত বাড়ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের পুঁজিপতিদেরও শোষণের ক্ষেত্র বাড়াতে, মুনাফা বাড়াতে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির সহযোগিতা প্রয়োজন। তাদের কারিগরি দক্ষতা ও অতিকায় পুঁজির সক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজেরাও মুনাফার একটা ভাগ ঘরে তুলতে চীনের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। গত এক দশক ধরে চীনের দিক থেকে এই প্রভাব ও বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা নীরবে বাড়তে থাকলেও করোনা মহামারি সময়ে চীন-ভারতের সংঘর্ষের পর থেকে তা আরও বেশি দৃশ্যমান হয়েছে কতিপয় ঘটনায়। লাদাখে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়েই চীনের তরফ থেকে বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ পণ্যের সেদেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশের ঘোষণা এসেছে। এসময় চীন করোনা মোকাবেলা বাংলাদেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও মেডিকেল টিম প্রেরণ করেছে। চীনা কোম্পানি উদ্ভাবিত টিকার তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল বাংলাদেশে হবে এই খবর এসেছে। বিশেষত তিস্তা প্রকল্পে চীনের ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের খবর আসার পর থেকে ভারত নড়েচড়ে বসেছে। তাই করোনা মহামারির মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্র সচিব দ্রুত বাংলাদেশ সফর করে গেছেন।

তাহলে কি সত্যিই বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে? ভারতের সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে? এরকম নানা জল্পনা বিভিন্ন মহলে চলছে। এটা সত্য অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের উপর চীনের প্রভাব আগের যেকোনো সময়ের থেকে বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভারতের তুলনায় চীনের ভূমিকা বেশি। শুধু ২০১৯ সালেই বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতের প্রায় ৫ গুণ। চীন বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে ৭৫ কোটি ডলারের পণ্য, যেখানে ভারত করে মাত্র ২৫ কোটি ডলার। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনই চীনের সাথে তার সম্পর্ক গাঢ় করছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও প্রভাব বিদ্যমান। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একতরফাভাবে ক্ষমতায় থাকার পেছনে ভারতের সমর্থনের বড় ভূমিকা আছে–জনমনে এমন ধারণা বিদ্যমান। অর্থনীতি পারস্পরিক সম্পর্কের মূল নিয়ামক হলেও এগুলোর প্রভাবও কম নয়। কখনো কখনো তা এমনকি অর্থনীতিকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক কারণেই নয়, ভারতের সাথে অমীমাংসিত কিছু ইস্যুও দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করেছে। বিশেষত নরেন্দ্র মোদি দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকারের হিন্দুত্ববাদী কার্যক্রম ও মুসলিমবিরোধী পদক্ষেপ এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বাণিজ্য অসমতা, সীমান্ত হত্যা, রোহিঙ্গা সমস্যায় ভারতের সমর্থন না পাওয়ায় সরকার চাপে পড়েছে। আবার গত বছর ভারতে যে এনআরসি ও সিএএ করা হয়েছে–যার মধ্য দিয়ে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালি মুসলিমদের ভারত থেকে বিতাড়ন কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি সরকার, তার ফলেও বাংলাদেশ সরকারের অসন্তুষ্টি রয়েছে। সেই সময় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছিলেন, সিএএ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এটার প্রয়োজন ছিল না। ফলে বিগত কয়েক বছরে বিজেপি সরকারের ভূমিকায় কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এমন গুঞ্জনও আছে যে, এবিষয়ে বাংলাদেশ তার মনোভাব জানাতে একাধিক মন্ত্রী তাদের ভারত সফরও বাতিল করেছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৭ মার্চ মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে নরেন্দ্র মোদির পূর্বনির্ধারিত বাংলাদেশ সফর স্থগিত হয়েছে। করোনার অজুহাত দেখানো হলেও কূটনৈতিক মহলের ধারণা–নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী ও মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভের সম্ভাবনা আঁচ করে সফর পেছানো হয়েছে।

কিন্তু দৃশ্যত যা-ই মনে হোক, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে অর্থাৎ ভৌগোলিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের প্রভাববলয় থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। ভারতও তার প্রয়োজনেই এটা কখনোই চাইবে না। চীনও এই অঞ্চলে ভারত-আমেরিকার মোকাবেলায় প্রভাববলয় বাড়াতে চাইবে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বাড়াতে চাইবে দুই দেশই। ইতোমধ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে দুদেশই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চীন প্রায় সে কাজ পেয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ভারতের চাপের কারণে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশকে সোনাদিয়া বন্দর নির্মাণ থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে দুই সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে এই ভূখণ্ড যুদ্ধেরও ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। ফলে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণিকে তার স্বার্থেই দু-কূল রক্ষা করে অর্থাৎ ভারত ও চীন উভয় দেশের মন যুগিয়ে চলতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ বাংলাদেশকে নিয়ে চীন-ভারতের এই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে অনেকে মনে করছেন, এতে বাংলাদেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ছে। সঠিকভাবে এগোলে দু'দিক থেকেই সে লাভবান হবে। বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্যের শুল্কমুক্ত ছাড় পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী বলে?

প্রথমত, চীন-ভারতের দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ছে আপাত দৃষ্টিতে এটা সত্য মনে হলেও, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। কখনো এক পক্ষের সাথে কোনো চুক্তি বা কিছু ক্রয় করলে আরেক পক্ষ নাখোশ হয়। তখন তাকে খুশি রাখতে আবার তার সাথেও নতুন কোনো চুক্তি বা কিছু ক্রয় করতে হয়। যেমন চীনের কাছ থেকে সাবমেরিন কেনার পর ভারত নাখোশ হলে তার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করে সরকার। যে চুক্তির ফলে ভারত বঙ্গোপসাগরের উপকূলে রাডার বসাবে। ফলে দেখা যায়, বড় দুটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে তাদের সাথে চুক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সমতা রক্ষিত হয় না। এতে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেরই প্রাধান্য থাকে। ফলে এই টানাটানিতে বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার চেয়ে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। আবার যেটুকু হয়তো লাভের দিক আছে তাতেও কার স্বার্থ? এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণির, নাকি জনগণের? পুঁজিপতিশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে হলেও এই সব চুক্তি করছে। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন–শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণিসহ শোষিত জনগণ এবং পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়। ফলে এযুগে বুর্জোয়াদের দ্বারা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করাও সম্ভব নয়।

দুর্বল পুঁজিবাদী দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্য দেখে অনেকেই মনে করেন–দেশে বুঝি জাতীয় বুর্জোয়াই গড়ে উঠেনি। তাই এদেশের শাসকদের দালাল, মুৎসুদ্দি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। তাঁরা বুঝতে পারেন না, দুর্বল পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও চীনের সাথে বাংলাদেশের ঘটনাবলিও তাই প্রমাণ করে। ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিও এদেশের বুর্জোয়াদের স্বাধীন চরিত্রের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু তারা দুর্বল চরিত্রের হোক কি স্বাধীন চরিত্রের

● ৭ এর পাতায় দেখুন

নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে নারীমুক্তি-ছাত্র ফ্রন্ট সংহতি সমাবেশ

সারাদেশে অব্যাহত নারী-শিশু ধর্ষণ নিপীড়ন নির্যাতন ও বিচারহীনতা এবং রাষ্ট্রীয় নির্বিকারত্বের প্রতিবাদে সংহতি সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ারের সঞ্চালনায় শাহবাগে অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, ডক্টরস্ প্ল্যাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ডা. মুজিবুল হক আরজু, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক রেহেনুমা আহমেদ, লেখক-মানবাধিকার কর্মী ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান, শিক্ষক শামীম জামান, লেখক ও গল্পকার মাহামুদুল হক আরিফ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনয়ন চাকমা এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নেতা সুস্মিতা রায় সুপ্তি।

সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ব্যক্তিত্ব। সংহতি জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা নিত্রা, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সিত্তুল মুনা হাসান, নতুন দিগন্ত পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মযহারুল ইসলাম বাবলা, কথাসাহিত্যিক রাখাল রাহা, অ্যাক্টিভিস্ট এবং ফটোগ্রাফার সাইফুল ইসলাম অমি, গবেষক মাহা মির্জা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাবর্ণি সরকার, কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক নভেরা হোসেন, চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

সারাদেশে নৃশংস নারী ধর্ষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সারা দেশ যখন প্রতিবাদমুখর, সবগুলো ঘটনায় যখন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা যুক্ত, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বললেন যে, "কোন দেশে ধর্ষণ হয় না?" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও অব্যাহত নারী নিপীড়ন দমনে তার ব্যর্থতার কারণে পদত্যাগ দাবি করে গত ৬ অক্টোবর প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে গণধিক্কার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

গণধর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র জোটের এমসি কলেজ অভিমুখে পদযাত্রা

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এর প্রতিবাদের ফুঁসে ওঠে গোটা সিলেট। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর জোট প্রগতিশীল ছাত্রজোট সিলেট শাখা এর প্রতিবাদে নামে ঘটনার পরপরই। গত ৩ অক্টোবর ছাত্র জোট এমসি কলেজ অভিমুখে পদযাত্রার আয়োজন করে। রাস্তায় রাস্তায় গণসংযোগ করে ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়নসহ ছাত্রজোটভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এই পদযাত্রা সফল করে।

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি **মুবিনুল হায়দার চৌধুরী**, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই-মেইল : mail@spbm.org